সত্যপীরের কলমে

এই অংশে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলি সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৪৫ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় সত্যপীর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। এগুলি এতাবৎকাল কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানা যায় নি। 'সত্যপীর' ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল বলেই এই অংশ 'সতপীরের কলমে' নাম অভিহিত হল। —সম্পাদক

লাক্ষাদ্বীপ

বহু বৎসর পূর্বে আমি মাদ্রাজ শহরে এক বন্ধুর বাড়িতে বাস করতুম। তখন চিনি বড্ড রেশনড্ ছিল। যে-ঘরের বারান্দায় বসেছিলুম সেখানে বন্ধুপত্নী কাগজে মোড়া চিনি একটা বোয়ামে রেখে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। সেই কাগজের টুকরোটা হাওয়ায় ভেসে ভেসে এসে আমার পায়ের কাছে ঠেকল। আমার চোখ গেল যে, কাগজটাতে আরবী হরফে কী যেন লেখা। আশ্চর্য। এই মাদ্রাজ শহরে চিনির দোকানে আরবী কাগজ এল কোথা থেকে? কৌতূহল হল। কাগজটি তুলে ধরে পড়বার চেষ্টা দিলুম। তখন দেখি আরবী হরফে যেসব ভাষা লেখা হয় এটা তার কোনোটাই নয়। আরবী নয়, ফারসী নয়, উর্দু নয়, সিন্ধী নয় (সিন্ধী আরবী হরফে লেখা হয়), কিছুই নয়। তুর্কী ভাষা আমি জানি না। কিন্তু তুর্কী ভাষা এই মাদ্রাজে এসে পৌঁছবে কী প্রকারে? একটি পাতার তো ব্যাপার; ধৈর্য সহকারে পড়ে যেতে লাগলাম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ শব্দটি দেখি "মুদরায়ে" অর্থাৎ মদুরা। তাহলে ইটি ভারতীয় ভাষা। তখন ছিন্ন পত্রখানা ফের সযত্নে পড়ে দেখি, খাস আরবী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মিশে আছে মালায়লাম ও তামিল শব্দও। হঠাৎ মাথায় খেলল, এটি তাহলে মপলাদের ভাষা। এরা আরব ও মালায়লমের বর্ণসঙ্কর। পরের দিন বন্ধু যখন কর্মস্থলে গেলেন তখন ছিন্ন পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে আমার অনুমানটি কনফার্ম করিয়ে নিলুম। এবং অনুসন্ধান করে আরো জানলুম, লাক্ষা-দ্বীপকে নিয়ে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত সেগুলোর ভাষাও নাক মোটামুটি ঐ একই।

হালে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী এই দ্বীপপুঞ্জটির সফরে গিয়েছিলেন। আমি আশা করেছিলুম, এই সুবাদে আমাদের দেশের ঐ অংশটি সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানতে পাবো। তা জেনেছি নিশ্চয়—এঁদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সাংবাদিক সবিস্তর বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল এঁদের প্রাচীন ইতিহাস জানবার। সে-বাবদে "যে তিমিরে সে তিমিরেই" রয়ে গেলুম।

প্রথম প্রশ্ন লাক্ষাদ্বীপ কথাটার অর্থ কি? ইংরিজিতে বানান করা হয় Laccadive এবং এর শেষাংশ "দীব" যে দ্বীপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আরবী ভাষায় "প" অক্ষরটি নেই বলে সে স্থলে "ব" বা "ওয়া" (অর্থাৎ ইংরিজি V অক্ষর) ব্যবহৃত হয়: তাই "দীব" বা "দীও" নিশ্চয়ই দ্বীপ। কিন্তু প্রশ্ন "লাক্ষা" শব্দের অর্থ কি? পণ্ডিতেরা বলেন, ওটা সংস্কৃত লক্ষ (১,০০,০০০)

থেকে এসেছে। অথচ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা মাত্র চোদ্দটি। এমন কি এই দ্বীপপুঞ্জের সংলগ্ন, মাত্র আশী মাইল দূরে অবস্থিত মালদ্বীপের (এ-এলাকা ভারতের অংশ নয়) চতুর্দিকে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে তার সংখ্যাও তিন শত (এর মধ্যে মাত্র সতেরোটিতে লোকাবাস আছে এবং এদের ভাষা আরবী মিশ্রিত সিংহলী)। এই তিনশ এবং লাক্ষাদ্বীপের চৌদ্দটি (বসতি আছে সাকুল্যে তাহলে বাইশটি দ্বীপে) নিলেও তাকে লক্ষ সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হলে এদেরকে হাজার হাজার ডবল প্রমোশন দিতে হয়। তবে কি না, কী হিন্দু পুরাণকার কী মুসলমান পর্যটক ঐতিহাসিক গণনা করার (শুমার করার) সময় বেশ-কিছুটা কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়ে ১০০ বা ১০০০-র পিছনে গোটা তিনেক শূন্য বসিয়ে দিতে কার্পণ্য করতেন না। এরই একটি উদাহরণ পাওয়া যায় বাঙলা দেশের কেচ্ছাসাহিত্যে: "লোক মরে লক্ষ লক্ষ, কাতারে কাতার।/ শুমার করিয়া দেখি আড়াই হাজার॥" তবু এ কবিটির কিঞ্চিৎ বিবেক-বুদ্ধি ছিল। উৎসাহের তোড়ে প্রথম ছত্রে "লক্ষ লক্ষ" বলে শেষটায় মাথা ঠাণ্ডা করে বললেন, "না, পরে গুনে দেখি, আড়াই হাজার।" অতএব আড়াই হাজার যদি লক্ষ লক্ষ হতে পারে তবে তিনশো দ্বীপকে মাত্র এক লক্ষে পরিণত করতে আর তেমন কি "ভয়াঙ্কর অসুবিস্তে"! তদুপরি মূল পাণ্ডুলিপির কপি করার সময় নকলনবীসরা শূন্য সংখ্যা বাড়াতে ছিলেন বড়ই উদারচিত্ত।

এতসব "যুক্তি" থাকা সত্ত্বেও আমি অতিশয় সভয়ে একটি নিতান্ত এমেচারি (ফোক ইটিমলজি) শব্দতাত্ত্বিক "গবেষণা" পেশ করি।

লাক্ষা শব্দের অর্থ গালা। "পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট-বিশেষের দেহজ রস হইতে ইহা উৎপন্ন হয়" (হরিচরণ)। এর রঙ লাল। হিন্দীতে এর নাম লাক এবং ইংরিজি ল্যাক এর থেকে এসেছে।...লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ নির্মিত হয়েছে এক প্রকারের কীটের রস থেকে। এর নাম প্রবাল এবং এর রঙ লাল, গোলাপি, সাদা ইত্যাদি হয়। কিন্তু প্রবাল বলতে সংস্কৃতে সর্বপ্রথম অর্থ: অঙ্কুর, কিসলয়, নবপল্লব—অতএব বৃক্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

তাই আমার মনে সন্দেহ জাগে সেই প্রাচীন যুগে যখন লাক্ষাদ্বীপের নাম-করণ হয় (এবং আর্যরা ঐ প্রথম প্রবালদ্বীপ, কোরাল্ আইল্যাণ্ড-এর সংস্পর্শে আসেন) তখন তাঁরা হয়তো "লক্ষ" সংখ্যার কথা ভাবেননি, তাঁরা এর নাম-করণ করেছিলেন লাক্ষার সঙ্গে এর জন্মগত, বর্ণগত, রসাগত রূপ দেখে॥

সিন্ধুপারে

লাক্ষা দ্বীপ নিয়ে বড্ড বেশী তুলকালাম করার কোনই প্রয়োজন থাকত না, যদি না তার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত থাকতো।

প্রথম প্রশ্ন : পশ্চিমদিকে ভারতীয়রা কতখানি রাজত্ব বিস্তার করেছিল ? কোন্ কোন্ জায়গায় তারা কলোনি নির্মাণ করেছিল ?

আমার সীমাবদ্ধ ইতিহাস ভূগোল জ্ঞান বলে, পশ্চিম দিকে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী থেকে প্রায় দু' হাজার মাইল দূরে, আদন বন্দরের প্রায় ছ' শ মাইল পুব দিকে সোকোত্রা দ্বীপে। ম্যাপ খুললেই দেখা যায়, এ-দ্বীপ যার অধিকারে থাকে সে তাবৎ লোহিত সাগর, আরব সমুদ্র এবং পার্শিয়ান গাল্‌ফের উপরও আধিপত্য করতে পারে।

এই সোকোত্রা দ্বীপের গ্রীক নাম 'দিয়োস্‌করিদেস্' এবং পণ্ডিতেরা বলেন এ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। মনে হয়, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নৌকোয় বেরিয়ে, দু' হাজার মাইল ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যে-কোনো জায়গায় পৌঁছলেই মানুষ সেটাকে 'সুখাধার' বলবেই বলবে। কিন্তু এ-দ্বীপের পরিষ্কার ইতিহাস জানবার তো উপায় নেই। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকরা বলছেন, এ দ্বীপে বাস করতো ভারতীয়, গ্রীক ও আরব বণিকরা। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা বলছেন, এটা তখন ভারতীয় বম্বেটেদের থানা। তারা তখন আরব ব্যবসায়ী জাহাজ লুটপাট করতো।

মনে বড় আনন্দ হল। এদানির 'অহিংসা' 'অহিংসা' শুনে শুনে প্রাণ অতিষ্ঠ। আমরাও যে একদা বম্বেটে ছিলুম সেটা শুনে চিত্তে পুলক জাগলো। বম্বেটেগিরি হয়তো পুণ্যপন্থা নয়, কিন্তু এ-কথা তো সত্য যে-দিন থেকে আমরা সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ করে দিলুম সেইদিন থেকেই ভারতের দুঃখ দৈন্য, অভাব দারিদ্র্য আরম্ভ হল।

সোকোত্রা দ্বীপকে মিশরীরা নাম দিয়েছিল 'সুগন্ধের সারিভূমি'—অর্থাৎ সারি কেটে কেটে যেখানে সুগন্ধ দ্রব্যের চাষ হয়। এবং এখনো সেখানে ঘৃতকুমারী (মুসব্বর), মস্তকি (myrrh), গুগ্‌গুল এবং আরো কি একটা উৎপাদিত হয়। মামি তৈরী করার জন্য মিশরীয়দের অনেক-কিছুর প্রয়োজন হত। এবং খুশ-বাইয়ের প্রতি ওদের এখনো খুবই শখ। খৃষ্টপূর্ব হাজার বৎসর আগে রচিত রাজা 'সুলেমানের গীতে' বিস্তর সুগন্ধের উল্লেখ আছে। এদের অধিকাংশই

যেত ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সোকোত্রা থেকে। এবং এই সোকোত্রাই ছিল ভারত ও আরব বণিকদের পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের মিলনভূমি। আরবদের মারফতে সে-সব গন্ধদ্রব্য বিলেত পর্যন্ত পৌঁছত। তাই শেকসপীয়র ভেবেছিলেন এ-সব গন্ধদ্রব্য বুঝি আরব দেশেই জন্মায়—লেডি মেকবেথ বলছেন, "অল দি পারফিউমজ অব আরাবিয়া উইল নট সুইটেন দিস লিটিল হ্যাণ্ড"। এই গন্ধের ব্যবসা তখন খুবই লাভজনক ছিল। এবং কাঠিয়াওয়াড়ের গন্ধবণিকরা এর একটা বড় হিস্যা পেতেন। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে এই সুবাদে স্মরণ যেতে পারে যে তিনি জাতে গন্ধবণিক—সেই 'গন্ধ' থেকে তাঁর পরিবারের নাম গাঁধী।

ভারতীয় বণিকরা লাক্ষাদ্বীপ বা মালদ্বীপ থেকে তাদের শেষ রসদ—এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস জল—নিয়ে এখান থেকে পাগের নৌকায় করে দু হাজার মাইলের পাড়ি দিতেন।

* * *

সচরাচর বলা হয়, আরব নাবিকরাই প্রথম মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করে। আমি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার ধারণা ভারতীয়রাই প্রথম লক্ষ্য করে যে শীতকালে বাতাস পশ্চিমবাগে বয়। তারই সুবিধে নিয়ে পাল তুলে দিয়ে পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা যেত সোকোত্রা। ফিরে আসত গ্রীষ্মারম্ভে—যখন সোকোত্রা থেকে পূব বাগে বাতাস বয়। ভারতীয় নাবিক যদি কোস্টাল সেলিংই (পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে) করবে তবে তো তারা সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থান, ইরানের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণ আরবিস্থানে পৌঁছে যেত। অর্থাৎ আদন বন্দরের কাছাকাছি। সেখান থেকে আবার ছ' শ মাইল পূব বাগে সোকোত্রা আসবে কেন?

তারপর কর্তারা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

সে-কথা আরেকদিন হবে।

প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ

সঠিক বাঙলা অনুবাদ হল কিনা তাই নিয়ে অনেকেরই মনে ন্যায্য সন্দেহ হতে পারে। ইংরিজিতে একে বলে "অল্ ইনডিয়া অরিএনটাল কনফারেন্স।" আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল এর নাম "অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস কনফারেন্স"। দুটো নামই আমার কাছে কেমন যেন সামান্য বেখাপ্পা ঠেকে। "অল্ ইনডিয়াই"

যদি হবে তবে তার সঙ্গে "অরিএনটাল" জোড়া যায় কী প্রকারে? পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নাম "অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস"ও কেমন যেন মনে সাড়া জাগায় না। অরিএনটালিসট বলতে বোঝায়, অরিএনট সম্বন্ধে যিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু রূঢ়ার্থে বোঝায়, যে সব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অরিএনট নিয়ে চর্চা করেন। এই নিয়ে যখন আমি আমার এক দর্শনে সুপণ্ডিতা বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করছি তখন তিনি বললেন, "হ্যাঁ। কেমন যেন ঠিক মনে হয় না। মাকসম্যুলার অরিএনটালিসট আবার রাধাকৃষ্ণনও অরিএনটালিসট?" আমার মনে হল, তাঁর মনে ধোঁকা জেগেছে, দুজনার মাহাত্ম্য কি একই? রাধাকৃষ্ণন তাঁর আপন দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করেছেন, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ যে সাত সমুদ্রের ওপারের মাকসম্যুলার ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করলেন—এ দুজনাতে তো একটা পার্থক্য আছে। তুলনা দিয়ে বলি, আপনি ভারতীয়, তাই আপনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাতসমুদ্রের ওপারের পুণ্যশ্লোকা এ্যানি বেসানত, দীনবন্ধু এ্যানড্রুজ যখন এ-আন্দোলনে যোগ দিলেন, সে দুটো কি একই?

যদ্যপি জরমন ভাষা কাঠখোট্টা তবু প্রাচী = অরিএনট এবং প্রতীচী = অকসিডেনট নিয়ে কথা বলতে গেলে ওরা ঐ দু ভূখণ্ডের জন্য দুটি বড়ই সুন্দর নাম দেয়। এই প্রাচ্যভূমিকে বলে "মরগেন লানট" = "ভোরের দেশ" "সূর্যোদয়ের দেশ"—জরমন ভাষায় "মরগেন" শব্দের অর্থ "সকাল" "ভোর"। তাই তারা সকালবেলা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে বলে "গুটেন মরগেন" = গুড মরনিং। পক্ষান্তরে তাদের নিজের দেশ তথা ইয়োরোপকে বলে "আবেনট লানট" অর্থাৎ "সূর্যাস্তের দেশ"। তাই বিকেল বেলা সন্ধ্যে বেলা, এমন কি রাত্রেও দেখা হলে বলে "গুটেন আবেনট"।

খুব সম্ভব এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি জরমন পণ্ডিতদের একটা বিনয়নম্র ভাব-শ্রদ্ধা আছে। ইংরেজ ফরাসী ডাচদের সে শ্রদ্ধা নেই। কারণ তারা প্রাচ্যভূমি এশিয়াতে রাজত্ব করতো। তাই এনারা যখন ইয়োরোপের কোনো "অরিএনটালিসটস কনফারএনসে" যান তখন কেমন যেন মুরুব্বিয়ানা করেন। ভাবটা এই, তাঁরা যে ভারতের ব্যাপারে ইনটরেসট দেখাচ্ছেন সেটা যেন, অনেকটা মুনিব তার চাকরের বউবাচ্চার সম্বন্ধে পলাইট বাট ডিসটেনট খবর নিচ্ছেন (পাছে না দু' টাকা খসাতে হয়)।

এই মুরুব্বীয়ানাটা আমাকে ঈষৎ পীড়িত করে। হপ্তা তিনেক পরে পূর্বে আমি বলেছিলাম আমি অত সহজে অপমানিত হই না। ইতিমধ্যে খান আবদুল গফফার বাদশা মিঞা বলেছেন, ভারত যে রাবাতে গিয়েছিল সেটা অনুচিত

হয়নি। কিন্তু পত্রান্তরে জনৈক সম্পাদক অতিশয় ভদ্র ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "কিন্তু সকলেই এ মত পোষণ নাও করতে পারেন" (নট এভরিবডি শেয়ারজ ইট) এবং এই আনন্দবাজারেই জনৈক পত্রলেখক আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি জানান। ধর্ম সাক্ষী করে বলছি, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ফরিয়াদ নেই। কে কোন আচরণে অপমানিত হবেন না হবেন সেটা তাঁর স্পর্শ-কাতরতার উপর নির্ভর করে। এঁরা স্পর্শকাতর। কিন্তু আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া। মরক্কো লেদার তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ—লম্বি লম্বি।

মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ইওরোপীয়রা বিশেষ করে ইংরেজ ফরাসী ডাচ যদি আমাদের প্রতি মেহের-বাণী দেখায় তবে আমরাই বা তাদের প্রতি মেহেরবাণী দেখাবো না কেন?

অতএব আমি প্রস্তাব করি এই ভারতবর্ষে যেন "অকসিডেনটালিসট কন-ফারেন্স্ নির্মিত হয়। ইয়োরোপের ইংরেজ ফরাসী ডাচ অরিএনটালিসটরা যে রকম আমাদের সতীদাহ, বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেন আমরা ঐ কনফারেনসে সাহেবদের কল গার্ল, কীলার প্রফুমো ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু বিপদ এই: আমাদের ভারতীয় সভ্যতা যায় নিদেন খৃ. পূ. দু' হাজার বছর পূর্বে। ইয়োরোপীয়দের সভ্যতা মেরে কেটে ছ'শ বছর পূর্বে। যতই প্রাচীন সভ্যতা হয়, ততই তাকেই আঘাত করা যায় বেশী। বুড়ো-ঠাকুরদাকে গাঁট্টা মারা খুবই সহজ।

এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য আমি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীরদ সি চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করি। ইয়োরোপীয় কাণ্ডকারখানা উনি বিলক্ষণ বিচক্ষণরূপে জানেন। তদুপরি তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে উত্তমতমরূপে সুপরিচিত। শেয়ানা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুদ্ধমাত্র ইয়োরোপীয় গুণীজ্ঞানীরই উদ্ধৃতি দেন।

পুনরপি প্রাচ্য

না আর রসিকতা না। এবারে আমাকে সিরিয়স হতে হবে। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরীও প্রতি বৎসরে এই শপথ নিতেন এবং সে-লিখিত শপথের কালি শুকোতে-না-শুকোতেই সেটি পরমানন্দে ভঙ্গ করতেন। আমি সেই মহাজনপন্থাই অবলম্বন করছি।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে কি-সব সমস্যা কি-সব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে

তার কিছু কিছু বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে এবং কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের সম্পাদক মহাশয় সে সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত তথা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে-সব বিষয়বস্তু কনফারেনসে আলোচিত হয়নি সে-সংবাদ জানবো কি প্রকারে? তাই আমার মনে দুটি সমস্যা জেগেছে। এ-দুটি নূতন নয়। আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে আমি যাই তিরু অনন্তপুরমে বরদা সরকারের প্রতিভূরূপে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি। সেই থেকে।

প্রথম: এই যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয়রা এশিয়াতে রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন—ইংরেজ ফরাসী অস্ট্রিয়ান ডাচ পর্তুগীজ ইত্যাদি ইত্যাদি—এদের মহাফেজখানাতে (আর্কাইভে) বিস্তর দলিলপত্র রয়েছে। এগুলোর সাহায্য বিনা ভারতের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এসব দলিলদস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করে সেগুলোকে প্রকাশিত করাতে স্বভাবতই আজ এদের আর কোনো ইনটরেস্ট্ নেই। যতদূর মনে পড়ে, একমাত্র ডাচ সরকারই বছর কয়েক পূর্বে এ-কর্ম করার জন্য ভারতীয়দের আমন্ত্রণ জানান এবং দুটি ভালো স্কলারশিপ দিতে চান। এর ফল কি হয়েছে জানিনে। অতএব এ-সব ভিন্ন ভিন্ন দেশের মহাফেজখানার অমূল্য দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব আমাদেরই—ভারতীয়দের।...এ-ছাড়া এদের আরকাইভে আছে, ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ ইত্যাদি। সেগুলোও মহামূল্যবান। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"—না কি যেন নাম—অনেকেই জানেন।

দ্বিতীয়: এবং এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। নমস্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা তো অগাধ গবেষণা করেছেন, যথা মহাভারত রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন, করছেন এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদির জন্যও ঐ পদ্ধতিতে তৎপর। এ-কর্মের প্রশংসা অজ্ঞ বিজ্ঞ তাবজ্জন করবেন। কিন্তু প্রশ্ন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রতিদিন ভারতীয়দের ইনটরেস্ট্ কমে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানো যায় কি প্রকারে? অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তম উত্তম ধন মূল সংস্কৃতে যত না হোক, অনুবাদ মারফৎ কোন্ পদ্ধতিতে সাধারণজনের সামনে আকর্ষণীয়রূপে দিতে পারি? এক কথায় সংস্কৃত, অর্ধমাগধী, পালি, প্রাকৃত, সান্ধ্য ইত্যাদিতে লিখিত প্রকৃত হীরাজওহর পপুলারাইজ করি কি প্রকারে? তারা যে কলচরড পারল, প্ল্যাসটিক চায়। এবং এটা না করতে পারলে যে প্রাচ্যবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্বজ্জনের মহতী বিনষ্টি হবে সে-বিষয়ে অন্তত আমার মনে

কণামাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, তুলনা দিয়ে বলি; জনগণ যেন দেশ-গাছের শিকড়, বিদ্বজ্জন ফুল। শিকড় যদি শুকিয়ে যায় তবে ফুলের, ফলের তো কথাই নেই, মরণ অনিবার্য।...যেমন আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নাভিশ্বাসের সময়ে আমাদের চৈতন্য হল এবং আমরা এখন সেটিকে পপুলারাইজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছি।

ইয়োরোপীয়দের ঐ একই সমস্যা। আমরা যেমন সংস্কৃতাদি একাধিক সাহিত্যের উপর এতকাল নির্ভর করে এসেছি, তারা করে দুটি সাহিত্যের উপর —গ্রীক এবং লাতিন। এবং চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এ-ভাষাগুলোর পড়ুয়া দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিলেতের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিন শেখার জন্য প্রতি বৎসর পাঁচটি এমনই দিলদরাজ বৃত্তি দেয় যে, যে-কোনো বৃত্তি-ধারী সে-অর্থে হস্টেলের খাইখরচা দিয়ে উত্তম বেশাদি পুস্তকাদি ক্রয় করার পর একাংশ দরিদ্র পিতামাতাকে পাঠাতে পারে। তথাপি, কাগজে পড়েছি, বছর তিনেক পূর্বে সেই পাঁচটি বৃত্তির জন্য মাত্র তিনটি ছাত্র দরখাস্ত পাঠায়!! বছর পঞ্চাশেক পূর্বে আসতো দুশো!!

এবং এহ বাহ্য। জনসাধারণও গ্রীক লাতিন সাহিত্যের অমূল্য অমূল্য সম্পদও ইংরিজি ফরাসী জর্মন অনুবাদে—যথা যার দেশ—পড়তে চায় না। তাই ইয়োরোপের বিদ্বজ্জন এসব সম্পদের নবীন নবীন অনুবাদ করছেন—দেশোপ-যোগী কালোপযোগী করে। এমন কি বাইবেলেরও।

আমাদের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা এ-বিষয়ে কি করছেন?

আমার মনে হয় কবি কালিদাস বাঙালী। প্রমাণ? একমাত্র বাঙালীই যে-ডালে বসে আছে সেটা কাটে। কালিদাসও তাই করতেন। অতঃ কালিদাস বাঙালী। প্রাচ্যজ্ঞরা ডালটা কাটছেন না বটে কিন্তু ডালটা যে শিকড়োত্থিত রসাভাবে শুষ্ক হয়ে ভেঙে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

সিলেটী সাগা

১

অ ডুরা! কুনার সাব্‌রে আরক্ কট্‌রা ছালন দেও।

অতিশয় বিশুদ্ধ সিলেটী উচ্চারণে বাক্যটি উচ্চারিত হল। আমি অবশ্য তার জন্য প্রস্তুত ছিলুম। যজ্ঞপিদেশ: লণ্ডনের টিলবারি ডক; কাল: ১৯৩১; পাত্র:

রেস্তোরাঁর মালিক। সে আমলে খাঁটি বিলিতি হোটেল-রেস্তোরাঁতে যে অখাদ্য নির্মিত হত সেটা হটেনটটীয় পর্যায়ের। কথায় বলে, ওট নামক বস্তুটি স্কটল্যাণ্ডে খায় মানুষ, ইংলণ্ডে খায় ঘোড়া। কিন্তু ঐ আমলে লণ্ডনের পোশাকী খানাও স্কটল্যাণ্ডের ঘোড়া পর্যন্ত খেতে রাজী হত না—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি লণ্ডনের 'লাঞ্চকে' বলতুম 'লাঞ্ছনা' আর সাপারকে বলতুম 'suffer'।

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এসেছেন শুনে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে যখন রাস্তায় নেমেছি তখন হঠাৎ এক সিলেটী দোস্তের সঙ্গে মোলাকাৎ। আলিঙ্গন কুশলাদির পর দোস্ত শুধালে, "অত রোগা কেন?" "একে দুর্দান্ত শীত, তদুপরি লণ্ডনের গুষ্টির-পিণ্ডি-চটকানো রান্না।" সংক্ষেপে বললে, "চলো"। এতদিন পরে সব ঘটনা আর মনে নেই—তবে বাসে করে যে অনেক অনেকখানি পথ যেতে হয়েছিল, সেটা স্পষ্ট মনে আছে। মোকামে পৌঁছে ভালো করে বেয়ারিং পাবার পূর্বেই দেখি, একটি ছোটখাটো রেস্তোরাঁর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে এবং কানে গেল পূর্বোক্ত "অ ডুরা—ইত্যাদি", যার অর্থ, "ও ডোরা, কোণের সাহেবকে আরেক বাটি ঝোল দাও।"

হালে কাগজে পড়লুম, বিলেতে যে সব পাক ভারতের রেস্তোরাঁ আছে তার শতকরা ৮০ ভাগ সিলেটীরা চালায়। অবশ্য ঐ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিলেতে অত ঝাঁকে ঝাঁকে পাক ভারতীয় রেস্তোরাঁ ছিল না; তবে সে-রাত্রেই জানতে পাই, যে-কয়টি আছে তার পনেরো আনা সিলেটীদের। এমন কি লণ্ডনের নাম-করা হতচ্ছাড়া তালু-পোড়া দামের এক ভারতীয় রেস্তোরাঁর শেফ্‌ও সিলেটী।

ইতিমধ্যে দোস্ত শশাঙ্কমোহন "অটলালার" (হোটেলওয়ালার) সঙ্গে বে-এক্তেয়ার গালগল্প জুড়ে দিয়েছেন—আহা, যেন বহু যুগের ওপার হতে লঙ লস্ট্‌ ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্মিলন। শশাঙ্ক আমাকে অটলালার পাশের একটা টেবিলের কাছে বসবার ইঙ্গিত দিয়ে আবার তার ভ্যাচর ভ্যাচরে ফিরে গেল। একটা দরজা খুলে যেতে দেখি, বেরিয়ে এল একটি প্রাপ্তবয়স্কা মেম। হাতের ট্রের উপর রাইস, কারি, ডাল, ভাজাভুজি। আমাদের দিকে নজর যেতেই মৃদুহাস্য করে গুড ঈভনিং বলে বয়সের তুলনায় অতি স্মার্ট পদক্ষেপে গট-গট করে প্রথম অন্যান্য খদ্দেরদের রাইসকার্যাদি দিয়ে সর্বশেষে "কোণের সাহেবের" টেবিলের উপর তার "ছালনের কট্রা" রাখলো। ইনিই তা হলে ডোরা।...জনা আষ্টেক খালাসী পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সশব্দে, ছুরি কাঁটার তোয়াক্কা না করে খেয়ে চলেছে। আর দুজন গোরা একান্তে বসে ঐ খাদ্যই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে। ডোরা ফিরে আসতে অটলালা তার ক্যাশ ছেড়ে এল। আমরা চার-

জন এক টেবিলে বসলুম। অটলালা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আমরা তো বেশী পদ রাঁধি না—আমাদের গাহক তো সবই খালাসী, দু'একজন গোরা মাঝে মধ্যে। কিন্তু আপনারা অতদূর থেকে মেহেরবাণী করে এসেছেন। ভালোমন্দ কিছু করতে হয়।" আমাদের আপত্তি না শুনে দুজনা রান্নাঘরে চলে গেল। শশাঙ্ক বললে, "আশ্চর্য, কুড়ি বছর হয়ে গেল এই আম্বরউল্লা এ-দেশে আছে, তবু এক বর্ণ ইংরিজি শিখতে পারেনি। ওদিকে ওর বউ ডোরা দিব্য সিলেটী বলতে পারে। খালাসী গোরা সব খদ্দের ও-ই সামলায়। তবে ওর ইংরিজি বোঝাটাও চাট্টিখানি কথা নয়। একদম খাস খানদানী ককনি।" আমি শুধালুম, "বিয়েটা —মানে সিলেটী খালাসী আর লণ্ডনী মেমেতে হল কি প্রকারে?" "কেন হবে না? তুমি কি ভেবেছ ডোরা কোনো অক্সফর্ড ডন-এর মেয়ে এবং কেমব্রিজের রেঙলার? আর হক্ কথাই যদি কই, তবে বলি, সামাজিক পদমর্যাদায় আম্বর মিয়া তাঁর মাদামের চেয়ে ঢের ঢের সরেস। মিয়া চাষীর ছেলে আর ডোরা মুচির মেয়ে। অবশ্য ডোরার মত লক্ষ্মী মেয়ে শতেকে গোটেক। আমাদের যে কী আদর করে, পরে দেখতে পাবে। আর—" এমন সময় আম্বর মিয়া সহাস্য আস্তে প্রত্যাবর্তন করে বললে, "আমাদের সুখদুঃখের কথাতে মাঝে মাঝে বাধা পড়বে, স্যর। ডোরাই খদ্দেরদের কাছ থেকে হিসেবের কড়ি তোলে। এখন রাঁধছে। ওটা আমাকে সামলাতে হবে।" আমি ভয় পেয়ে মনে মনে বললুম, মেমের হাতের রান্নায় আবার সেই "লাঞ্চনা", আবার সেই "সাফার"! আমরা তো গাঁটের রোক্কা সিক্কা ঝেড়ে হেথায় পৌঁছলুম, আর ঐ হতভাগা লণ্ডনী লাঞ্চনা-সাফার কোত্থেকে বাস-ভাড়া যোগাড় করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করলে? প্রকাশ্যে "রোস্টোমোস্টো রাঁধবে নাকি?"

হেসে বললে, "তাও কি কখনো হয়, স্যর! রাঁধবে খাঁটি সিলেটী রান্না।"

"শিখলো কার কাছ থেকে?"

"আমার কাছ থেকেই সামান্যই।" কিন্তু আমার গাহক খালাসী-ভাইদের ভিতর প্রায়ই বাড়িয়া বাড়িয়া বাবুর্চী থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে সিলেটের পোশাকী খানা থেকে মামুলী ঝোল-ভাত সব-কিছু শিখে নিয়েছে—"। এমন সময় কোণের গোরা রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে সামান্য গলা চড়িয়ে বললে, "ও মিসিস উল্লা, আজকের কারিটাতে একদম ঝাল নেই। দুটো গ্রীন চিলি—সরি—সে তো এই গড ড্যাম দেশে নেই। তা হলে একটু টাবাস্কো চিলি সস্ দাও না।" বলে কি ব্যাটা! ডোরা যখন রাইস-কারি নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে-কারির কটকটে লাল রঙ দেখে আঁৎকে উঠে আমার মত খাস সিলট্যাও মনস্থির করেছিল

ঐ বস্তু কম মেকদারে খেতেহবে—চাটনির মত, আ লা চাটনি। আর এ-গোরা হট, হট, ডবল হট মাদ্রাজী আচার দিয়ে তার ঝোলের ঝাল বাড়ালে।... একে একে, দুয়ে তিনে সব খদ্দের কড়ি গুনে চলে গেল। আমার চোখে একটুখানি ধাঁধাঁর ভাব দেখে বললে, "ঠিক ধরেছেন, স্যর। সক্কলের জেবে কি আর রেস্ত থাকে? ইনশাল্লা, দিয়ে দেবে কোনো এক খেপে। আর নাই বা দিলে।"

আমরা খেয়েছিলুম, বেগুন-ভাজা, মুড়িঘণ্ট, মটরপোলাও, মাছ ভাজা, মুর্গী কারি—বাকি মনে নেই। অসম্ভব সুন্দর রান্না। কিন্তু আর শুধোবেন না। আহারাদির আলোচনা আরম্ভ হলে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। রাতও তখন অনেক। মোকা পেয়ে শশাঙ্ককে কানে কানে বললুম, "বিল?"

"চোক্কোরো। ও-কথা তুললে আম্বর-উল্লা ভ্যাক করে কেঁদে ফেলবে।"

শুধু কি তাই। বিদায় নেবার সময় ডোরা দোস্ত শশাঙ্কের হাতে তুলে দিলে একটা বাস্কেট। পথে নেমে সেটাকে প্রিয়ার গণ্ডদেশে হাত বুলোবার মত আদর করতে করতে বললে, "তিন দিনের দু-বেলার আহারাদি হে দোস্তো দুজনার —তিনজনারও হতে পারে॥"

২

ঠিক কোন্ সময়ে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করেন ঠিক বলা যায় না। তবে এর ফল যে বিষময় হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই চট্টগ্রাম এবং সিলেটের (সিলেট সমুদ্রতীরবর্তী নয়, কিন্তু সিলেটে বিরাট বিরাট হাওর থাকায় মাঝিরা অন্ধকারে তারা দেখে নৌকা চালাতে পারে—লিণ্ডসে সাহেব গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে কম্পাসের সাহায্যে একাধিক হাওর পেরিয়ে চাল-ভর্তি মহাজনী নৌকা মাদ্রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন—এবং সী-সিকনেস তাদের হয় না) লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী মাঝিমাল্লা অন্নহীন হয়ে যায়। এরপর আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে ব্যবসা করতে এলে এরা প্রধানত পেটের দায়ে মুসলমান হয়ে গোড়ার দিকে আরব জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে পূর্বে ইন্দোনেসিয়া ও পশ্চিমে জেদ্দা, সুয়েজ বন্দর অবধি পাড়ি দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের সদাগর সম্প্রদায় আপন আপন পালের জাহাজ নির্মাণ করে বর্মা মালয়ের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে থাকে এবং এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজের কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

প্রধানত সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির মাঝিমাল্লা চাষাভুষোই গোড়ার দিকে ইয়োরোপীয় জাহাজে কাজ নেয় এবং এদের খালাসী বলা হত (এ স্থলেই

উল্লেখ করি সংখ্যায় প্রায় আশী হাজারের মত যে-সব সিলেটি বর্তমানে ইংলণ্ডে কলকারখানায় কাজ করে—শুনেছি সিলেটিদের তুলনায় পুব পাকের অন্যান্য জেলার লোকসংখ্যা নগণ্য—দেশের সিলেটবাসীরা এদের নাম দিয়েছেন 'লণ্ডনী', যদিও এদের বড় আড্ডা বোধ হয় নটিংহামে)। বহু বৎসর ধরে খালাসীরা ডাঙায় বাসা বেঁধে কলকারখানায় ঢোকেনি। কিন্তু বেশ-কিছু সংখ্যক সিলেটি ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানায় ঢুকে প্রচুর পয়সা কামিয়ে দেশে ফিরতো—ওখানে চিরতরে বাসভূমি নির্মাণ করতো না।

খালাসীবৃত্তি থেকে কবে কি করে এরা দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডের কলকারখানায় ঢুকে পড়ে 'লণ্ডনী' খেতাব পায় তার কোনো লিখিত বিবরণ আমি পড়িনি। তবে আমার মনে হয়, ১৯২৯-৩৩-এর পূর্বে নয়, কারণ ঐ সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার কারখানাকর্মীদের ভিতর প্রচুরতম বেকারি। এরপরে, প্রধানতঃ যুদ্ধের সময় বিস্তর সস্তা লেবারের প্রয়োজন হল। আজ যে আপনি আমি লণ্ডন নটিংহামের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরিজি রেস্তোরাঁতেও 'পাটনা রাইস এবং কারি' পাচ্ছি তার গোড়াপত্তন হয় ঐ সময় ('পাটনা রাইস' বলে বটে, কিন্তু সেটা দেরাদুন, বাসমতী সব-কিছুই হতে পারে। বহু গবেষণা করে সন্ধান পেলুম কোম্পানির আমলে এ-দেশ থেকে যে-চাল বিলেত যেত সেটা প্রধানত সংগ্রহ করা হত পাটনার আড়তে যে-হরেক প্রদেশের চাল জড়ো হয়েছে তার থেকে ; তাই এর অমনিবাস নাম হয়ে যায় 'পাটনা রাইস') সৈন্যদের এবং 'লণ্ডনীদের' ক্ষুধা নিবারণের জন্য। আজ এদেশ থেকে প্রতিদিন মণ মণ চাল, ডাল, শুঁটকি, মসলা ইত্যাদি তো যাচ্ছেই, তার উপর হাজার হাজার বোতল আম, নেবু, জলপাইয়ের আচার। গত বৎসর সিলেটে এক বিরাট আচার ফ্যাকটরি দেখে আমি স্তম্ভিত। পরে সে কারখানার অমায়িক মালিকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'যা তৈরী হয় তার প্রায় বেবাক মাল চলে যায় লণ্ডনীদের খেদমতে। চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আমি পেরে উঠছি না।' অবশ্য আমি জানতুম, মালদার ম্যাংগো স্লাইজ এবং মিষ্টি-টক (সুঈট-সাওয়ার) আমের আচারের এক বৃহৎ অংশ লণ্ডনী-দের তরেই যায়। কারণ সিলেটের আম জঘন্য। তার থেকে ভালো আচার হয় না—স্লাইস মাথায় থাকুন অবশ্য সিলেট থেকে সর্বোৎকৃষ্ট আনারস-স্লাইস বিলেত যায়। মার্কিন হাইনৎস ফিফটি সেভনের (বা অন্য সংখ্যাও হতে পারে) মত সিলেটি আচার কারখানা ৪৭ রকমের আচার, স্লাইস ইত্যাদি তৈরী করে। বুঝুন যে সিলেটি দেশে ভাত, লাল লঙ্কা পেশা, আর কিঞ্চিৎ নিতান্তই মেহেরবান হলে একটি কাঁচা প্যাঁজ খেত—তাও দু বেলা নয় এবং সে-ও পেট ভরে নয়—সে কি না

আজ সিলেটের জমিদার-ছেলেরও যা জোটে না বিলেতে বসে তাই খায়। এস্তেক পান তক। পান যায় প্লেনে। তাই নাকি একটা খিলির দাম সিক্স্ পেন্স্ থেকে এক শিলিং!

সিলেটীরা বিলেতে চাকরি পায় কেন? কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, সাদা আর কালো মজুরে সেখানে নিত্য লড়াই। আমি এ-বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত-তাবাশ করিনি। যা শুনেছি, তাই বলছি: (১) কালোরা—বিশেষ করে সিলেটীরা—কম মাইনেতে কাজ করতে রাজী; নিগ্রোরা মদ খায়, জুয়া খেলে বলে তাদের খাঁই বেশী। (২) দুই শিফটে এবং রবিবারেও কাজ করতে রাজী—নিগ্রোরা খৃষ্টান, রবিবারে সাবাৎ মানে। (৩) ট্রেড ইউনিয়ন এড়িয়ে চলে, স্ট্রাইক করতে চায় না। (৪) রাত ভর মদ খেয়ে পরের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে না বলে কাজকর্মে কামাই দেয় কম।

এই সিলেটীরা অনেকেই মেম বিয়ে করে ওদের একটা দু-আঁসলা সমাজ গড়ে তুলেছে এবং ঘটকালি করে এই মেমেরা নবাগত সিলেটীকে তাদের বোন ভাগ্নী বিয়ে দেবার জন্য। বোন ভাগ্নীও "লণ্ডনী"র বউয়ের কাছ থেকে জেনে গিয়েছে (১) সিলেটী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বউকে ঠ্যাঙায় না (২) ঘোড়ার রেস, কুকুরের রেস, এমন কি কড়ি খর্চা করে ফুটবল খেলা দেখতেও যায় না, মদে পয়সা ওড়ায় না এবং কোনো প্রকারের জুয়োও খেলে না বলে বউ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাবার জন্য স্বামীর মাইনের একটা বড় হিস্যে পায়। বিয়ের পূর্বে বা পরে সে অন্য মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া করে না—সে তো ধলা মেম পেয়েই খুশ! এ দুটো সেকুরিটি পৃথিবীর সর্বত্রই রমণীমাত্রই খোঁজে। এবং কেউ কেউ তৃতীয় সেকুরিটিও দিতে পারে—আপন পরসায় কেনা নিজস্ব কটেজ। আমার পরিচিত এক চৌধুরীর ছেলে তো নটিংহামে তিনখানা চেন্ হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক (আজকাল সিলেটী মুসলমানদের উচ্চশ্রেণীর লোকও নানা ধান্দায় "লণ্ডনী" হচ্ছেন)। তিনি তো অনায়াসে তৃতীয় সেকুরিটি দিতে পারেন। এছাড়া ছোট-খাটো আরো অনেক আরাম আয়েস আছে। বাচ্চা রাত্রে কেঁদে খাস-সায়েব মজুরের ঘুম ভাঙালে সে ধমক দিয়ে বউকে বাচ্চাসহ রান্নাঘরে খেদায়; "লণ্ডনী" গায়ে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে। দেশে ছেলেবেলা থেকেই সে কত ভাতিজা-ভাতিজী ঠাণ্ডা করেছে।...পাব-এ যায় না বলে প্রায়ই তার ফুরসৎ থাকে এবং বউকে প্রেম করে বলে প্র্যাম-এ করে বাচ্চাকে হাওয়াভী খাওয়ায়।

৩

"অ ভাই, জলদি আও, বেটিয়ে ডাকে।"

একদম ন'সিকে খাঁটি সিলেটী উচ্চারণ। অবশ্য আমি খুব-একটা হকচকিয়ে উঠিনি, কারণ ঢাকার এ্যার-পর্‌টে হরহামেশাই সিলেটী উচ্চারণ শোনা যায়। কিন্তু যে প্রৌঢ় লোকটি এই মধুর আহ্বান শোনালেন, তাঁর পরনে দেখি উত্তম বিলিতি কাট্‌-এ অত্যুত্তম ১০০% বিলিতি উলের নেভি ব্লু স্যুট। ওদিকে গল-কম্বল মানমুনিয়া চাপ দাড়ি। যাকে ডাকছিলেন তারও ঐ বেশ, তবে বয়সে যুবক। কিন্তু ঐ "বেটিয়ে ডাকে" অর্থাৎ "মেয়েছেলে ডাকছে"—এর বিগলিতার্থটা কি? তখন এ্যার-পর্‌টের প্রধান লাউনজে ঢুকে দেখি একপাল লোক: প্রায় সকলেরই পরনে একই ধরনের নেভি ব্লু স্যুট। বুঝে গেলুম এরা "লনডনী"। বাড়িতে এসে দাদাকে তাবৎ হাৎ বয়ান করলুম। দাদা বললে, লনডনীরা ঈদের পরবে প্লেন চার্‌টার করে দেশে যায়। সে চাউস প্লেন সিলেটে নামতে পারে না বলে ঢাকা অবধি এসে থেমে যায়। তারপর সাধারণ সারভিসে আপন আপন মোকামে যায়। শ্রীমঙ্গল, শমসের নগরের মত ছোট ছোট জায়গায়ও প্রধানত এদেরই জন্য এ্যার স্ট্রিপ করা হয়েছে। আর ঐ যে চাপ দাড়ি-ওলা লোকটাকে দেখলি সে খুব সম্ভব লনডনীদের বিলেতের মসজিদের ইমাম। এ-ই এদের বিলেত থেকে আপন আপন মোকাম অবধি দেখ-ভাল করে পৌঁছিয়ে দেয়। এদেরই একজন বোধ হয় ছিটকে পড়েছিল, ইতিমধ্যে তরুণী এনাউনসার মাইকে বলেছে সিলেটীগামী প্লেন এখ্‌খুনি ছাড়বে। তাই ইমাম হাঁকছিল, "বেটিয়ে ডাকে, জলদি আও"। সিলেটী মাত্রই জানেন, সে-ভাষায় "বেটী" ঠিক "দুহিতা" বা "মেয়েছেলে" নয়। বরঞ্চ "মেয়েমানুষ" এমন কি "মাগী" অর্থেও ধরে। পশ্চিমবঙ্গে যখন কেউ বলে "বেটির কাণ্ড দেখ!" তখন যে অর্থ ধরে। এখন পাঠক বুঝুন, সেই খাবসুরৎ তরুণীকে "বেটি" বললে কোন্ রস সৃষ্ট হয়!

লনডনীরা প্রতি বৎসর সিলেটে কত টাকা পাঠায় তার হিসেব কেউ দিতে পারে না। কারণ এরা কালোবাজারে খুব ভালো রেট পায় বলে এদের পাঠানো টাকার খুব বড়-একটা হিস্তের কোনো সন্ধানই কেউ জানে না। শুনেছি কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কালোবাজারে লনডনীদের কাছ থেকে পাউন্‌ড কিনে তাদের নারায়ণগঞ্জস্থ আপন পাট গুদোম জুট মিলকে কোড-এ হুকুম দেয়। অমুক সিলেটীকে অত টাকা পাঠাবে। আরো শুনেছি, তার পর ঐ পাউন্‌ড দিয়ে বিলিতি জিনিস কিনে, কিছুটা আইনত, বেশীর ভাগ কালোয় প্রাচ্যে পাচার করে।

কত টাকা লনডনীরা পাঠায় তার হিসেব না-জানা থাকলেও সিলেট জেলাতে সে টাকার সুদূরপ্রসারী গভীর প্রভাব সর্বসিলেটীর চোখে যেন ঘুষি মেরে আপন মাহাত্ম্য অহরহ প্রচার করে। সস্তা সেকেনহ্যানড বিদেশী ট্র্যানজিসটার, পারকার কলম, ক্যামেরা ইত্যাদির কথা বাদ দিচ্ছি—একমাত্র সিলেট শহরেই নাকি গণ্ডা দুই সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্র্যাভেল এজেনসি আছে—কল্পনা করতে পারেন এ-জিনিস বর্ধমানে? মহকুমা শহরের কথা বাদ দিন, বড় বড় থানায়—বিশেষত যে-সব পকেটে লনডনীদের আদি নিবাস—পর্যন্ত বড় বড় ব্যাঙ্কের ব্রানচ আপিস খোলা হয়েছে। আর ডাকঘরের তো কথাই নেই। যে-ডাকঘরে দিনে তিন-খানা চিঠিও আসে কি না, সেখানে আসে পাঁচশ', হাজার টাকার মনিঅরডার। কিন্তু এহ বাহ্য। যে-সিলেট শহরের বন্দর-বাজারে মাছের কখনো অভাব হয়নি সেই বাজারে দর আগুন এবং শৌখিন মাছ বিরল। আমার এক মুরুব্বি বললেন, "আসবে কোত্থেকে? লনডনীর পাঠানো টাকাতে এখন গাঁয়ের লোক মাছ খায়। জেলে তকলীফ বরদাস্ত করে শহরে আসবে কেন? বললে প্রত্যয় যাবে কি, পাঁচখানা গাঁয়ের মাঝখানে যে-হাট, সেটা এই কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বসতো সপ্তাহে এক দিন এক বেলা। এখন বসে রোজ, প্রতিদিন, দু'বেলা।"

এটা আবার কনফারম করলো আমার এক বোন। গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে এবং লনডনীরা যখন দেশে আসে তখন প্রায়ই ব্যাঙ্কের চিঠি-পত্রাদি পড়াবার জন্য জমিদার বাড়িতে আসে। বোন বললে, "এক লনডনী দেশে এসেছে ঈদ করতে। মাছ কিনতে গেছে ভিন গাঁয়ের হাটে। একটা ভাল মাছ দেখে দাম শুধোলে। জেলে বললে ওটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেটা কিনেছে ঐ গাঁয়েরই এক লনডনী, এবং দুই গাঁয়ে দারুণ আড়াআড়ি। ভিন গাঁয়ের লনডনীর এক দোস্ত প্রথম লনডনীকে খোঁচা দিয়ে যা বললে তার অর্থ তোমাদের গাঁয়ে এ-মাছ খাবার মত রেস্ত আছে কার? প্রথম লনডনী বড় নিরীহ, কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু তার গাঁয়ের সঙ্গী-সাথীরা চটে গিয়ে তাকে বললে, "আল্লার কসম, এই, এই মাছটাই তোকে কিনতে হবে।" তখন মাছ চড়লো নিলামে। দশ, বিশ, শ', দু'শ চড়চড় করে চড়ে গেল। কবিগুরুর ভাষা একটু বদলালে দাঁড়ায়,

"দশ মাষা দিব আমি"
কহিলা লনডন-ধামী,
"বিশ মাষা" অন্য জনে কয়।
দোঁহে কহে "দেহো দেহো",

হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

আমার বোনটি অতিরঞ্জনে অভ্যস্ত নয়। শেষটায় বললে, "আখেরে মাছটা বিক্রি হল এক হাজার এক টাকা মূল্যে। কিনলো প্রথম লনডনী। এবং আশ্চর্য নগদ টাকা তার ওয়াস্‌কিটের পকেট থেকেই বের করল। তার পর বিজয়ী গ্রাম মাছটাকে নিয়ে প্রসেশন করে গ্রামে এসে আপন গাঁ প্রদক্ষিণ করলো। বিস্তর জিন্দাবাদ জিগিরের পর মাছটাকে ব্লেড দিয়ে প্রায় ডাকটিকিটের সাইজে টুকরো টুকরো করে গাঁয়ের সব্বাইকে বিলোলো। এখন এরা হাটে গিয়ে দেমাক করে, 'আজার টেকি (হাজার টাকা দামের) মাছ খাই আমরা'।"

কিন্তু এহ বাহ্য। সমাজবিদ্‌দের কান খাড়া হবে শেষ তত্ত্ব এবং তথ্যটি শুনে। লনডনী যত টাকা নিয়েই গ্রামে ফিরুক না কেন, জমিদার মিরাশদারের (যদ্যপি এখন আর জমিদারী নেই) বৈঠকখানায় শব্দার্থে এখনো তারা কলকে পায় না। অথচ তারা "জাতে উঠতে" চায়। তাই তারা হন্তে হয়ে উঠেছে সদরে, মহকুমা টাউনে বাড়ি কিনতে। সেখানে কে কার খোঁজ নেয়? এক বা দু'পুরুষে সবাই ভুলে যাবে তাদের উৎপত্তি, পেশা, জন্মস্থল। ফলে সিলেট শহরে যে-বাড়ির দাম পাঁচ বছর আগে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, এখন লনডনী দেড় লাখ হাঁকছে। একাধিক পেনশনার ভাবছেন সিলেটের বাড়ি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে ঢাকাতে ঐরকম বাড়িই যখন পাবো (সিলেট জেলার বাইরে লনডনী বাড়ি চায় না) তখন ছেলে-নাতির পড়াশুনোর সুবিধের জন্য—ক্যাপিটালে বাস করার আরও সুবিধে—সেখানেই যাই না কেন? যিনি আমাকে এ-ব্যাপারটির কথা বললেন, তিনি প্রাগুক্ত ঐ "মছলী-কহানীও" জানতেন। শেষ করলেন এই বলে—"আগে প্রবাদ ছিল 'মাছ খাবি তো ইলিশ, লাং ধরবি তো পুলিশ', এখন হয়েছে 'মাছ খাবি ন'মণী, লাং ধরবি লনডনী'। কিন্তু এটা চালু হবে না। লনডনীরা সচ্চরিত্র।"

৪

এই পর্যায়ের কীর্তনকাহিনী (সাগা)-র কালি ভালো করে শুকোবার পূর্বেই দেখি হঠাৎ আমি সিলেটীদের মাঝখানে। তবে খাস সিলেটে নয়, লণ্ডনে। এবং বিরাট লণ্ডনের সব কটা সিলেটী রেস্তরাঁ চষতে হলে পুরো পাক্কা ছটি মাস লাগার কথা।

প্রথম যেটিতে গেলুম, সেটা নিতান্তই যোগাযোগের ফলে। লণ্ডনে যে এ্যারপর্টে নাবলুম সেখান থেকে খাস লণ্ডন নিদেন ত্রিশ মাইল দূরে। তিনজন পরিচিতের ঠিকানা নোটবুকে টোকা ছিল। এক সহৃদয় ইংরেজকে সে-তিনটে

দেখিয়ে শুধোলুম, সবচেয়ে কাছে পড়ে কোন্‌টা। এক ঝলক দিঠি হেনেই বললে, "গঙ্গা" রেস্তরাঁ। তাই সই। গেল বছরে যখন ওর মালিক পঁচিশ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে বাপ-মাকে দেখতে দেশে আসে তখন আমাকে জোর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, তার রেস্তরাঁ আছে, ফ্ল্যাট আছে ; আমি যদি দয়া করে পদধূলি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কোথায় কি ? আমি ভেবেছিলুম, সেই যে চল্লিশ বছর পূর্বেকার টিলবারি ডকের সিলেটী রেস্তরাঁ—যার কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি—সেই ধরনের গরীবগুরবোর "অটল"ই (হোটেলের সিলেটী উচ্চারণ ; তবে সিলেটীতে এ্যাক্‌সেন্‌ট্‌ আছে বলে সেটা পড়বে "অ"-র উপর) হবে। তবে কি না, নিতান্ত মহারানীর আপন নগরের মধ্যিখানে থানা গেড়েছে যখন, তবে হয়তো দেয়াল ছাদে দু'এক পলস্তরা পাউডার-রুজ মাখিয়ে নিয়েছে।

কোথায় কি ? পরিপাটি ছিমছাম পশ্‌, শিক্‌। বাদবাকি সব-কিছু পর্যবেক্ষণ করার পূর্বেই দূর থেকে মালিক ("অটলালা" = হোটেলওয়ালা) আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে। "আউকা, আউকা ; বউকা বউকা" (আসুন, আসুন ; বসুন, বসুন)। তারপর দিলে ছুট রেস্তরাঁর গর্ভগৃহের দিকে—পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বউকে নিয়ে আসতে।

টেবিল-ক্লথ, ন্যাপকিন মুরমুরে পয়লা নম্বরী আইরিশ লিনেনের, ফুলদানীতে যেন বাগান থেকে সদ্য তোলা, শিশির-ভেজা গোলাপ, ছুরি-কাঁটা তথা যাবতীয় কাটলারি যেন মোগল আমলের খাঁটি রূপোর, আর গেলাস-বৌল এমনই স্বচ্ছ যে ভয় হল যে দুর্যোধনের মত স্ফটিককে জল ভেবে, আমিও এ-গুলোর দু'একটা দেখতে না পেয়ে ভেঙে ফেলি !

ডান দিকে কাঁচে ঘেরা একটি চৌকো কুঠরি। ভিতরে সারি সারি শেলফে সাজানো দুনিয়ার খাসা খাসা মদ্যাদি। বোতলের আকার-প্রকার রঙ-লেবেল দেখেই বোঝা যায়। কুঠরির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি খাপসুরৎ জোয়ান ছোকরা ন্যাপকিন দিয়ে ওয়াইন শ্যাম্‌পেন ; বিয়ার-মাগ্‌ সাফসুৎরো করছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল। ছোকরার মুখের আদল দেহের গঠন সিলেটীর মত। কিন্তু রঙটা ? গোরাদের মত ফর্সা নয়, আবার সিলেটীর মত শ্যাম-হলদেও নয়। সমাধান কিন্তু সহজ। গলা বাড়িয়ে সিলেটীতে শুধোলুম, "ভাই সাহেব, আপনার দেশ কোথায় ?"

গোটা কয়েক গেলাস ভেঙে ফেলে ছিল আর কি ! গলার আওয়াজ হোঁচট খেতে খেতে, খাবি খেয়ে খেয়ে, পড়িমরি হয়ে বললে, 'জী, জী, জী ; আমি সিলেটের, ফেচুগঞ্জের।.....এখানে যারা কাজ-কাম করে সবাই সিলেটী।"

(আমরা মারওয়াড়িদের দোষ দি ; তারা শুধু দেশের ভাইয়াদেরই চাকরি দেয়। সমস্যাটার সমাধান এখনো করতে পারিনি।)

ইতিমধ্যে মালিক এসে গেছেন। তাঁর গৃহিণীর—মেমসাহেবার—প্রথম কথা কটি শুনেই আমার মনে সন্দেহ হল, যদিও এঁর ইংরিজি উচ্চারণ উত্তম—অন্তত আমার চেয়ে ভালো—তবু ইনি বোধ হয় কন্টিনেনটাল। ভারী মিষ্টি স্বভাবের, লাজুক, স্বল্পভাষী রমণী। মালিকের মাথায় হঠাৎ কি যেন আচমকা ভাবোদয় হল। বললে, "আপনি তো একদা জরমনিতে পড়াশুনো করেছিলেন ; এখনো নাকি ঐ দেশের ভাষা বলতে পারেন। ইনি (বউয়ের দিকে তাকিয়ে) খাঁটি জরমন।"

এ্যাতক্ষ্যাণ ব্যাললেই হত। মেমও সঙ্গে সঙ্গে জরমন বলতে আরম্ভ করলো। ওর উচ্চারণ থেকে মনে হল সে ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মেয়ে।

সোমদেবের চরম কৃপাই বলতে হবে! যে-প্লেনে জরমনি থেকে লণ্ডন এসেছিলুম সেটাতে ঐ ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মোলায়েম ওয়াইন সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল। লণ্ডনে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ডেরা পাবো, তা তো জানিনে। যদি-স্যাৎ কাজে লেগে যায়। তাই এক বোতল কিনে নিয়েছিলুম। আর যাবে কোথা! এক কোণে ডাঁই করে রাখা লাগেজ থেকে বোতলটি বের করে ম্যাডামের সামনে রেখে বললুম, "এই নিন। ৎস্বম ভোল জাইন, আ ভৎর্‌ সাঁতে-হিয়ার ইজ্‌ টু ইউ'—এসব তান্ত্রিক মন্ত্রের অর্থ আমি এখনো সঠিক জানিনে। তবে মোটামুটি দাঁড়ায় "ইটি পান করে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক, "আপনার সর্বমঙ্গল হোক" ইত্যাদি। উভয় পক্ষ উভয়ের একই মঙ্গল কামনা করেন। মদ্য পান করে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় কি না জানিনে—শুনেছি গত যুদ্ধে ফ্রান্‌স্‌ হেরে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পেতাঁ যখন প্রথম বক্তৃতা দেন, তখন তিনি বলেন, "অত্যধিক মদ্য পান হেতু ফরাসী সেপাই ঠিকমত লড়তে পারেনি"—কিন্তু এটাই রেওয়াজ এবং ম্যাডামের চোখ ছল ছল করে উঠলো। কোথাকার কোন্‌ ইণ্ডিয়ান—তার দেশের জিনিস, এ স্থলে প্রতীক বলতে হবে, এনেছে। এটা কি কম কথা। ভাবুন, আপনি নিউজীল্যাণ্ড বা ওসলোতে। সেখানে কেউ নিয়ে এল আপনার জন্য পাটিসাপটা ক্ষীরের মালপো দেদো সন্দেশ! তদুপরি সে বাঙালী নয়।

ইতিমধ্যে দুটি একটি করে খদ্দের আসতে আরম্ভ করেছে। তার থেকে বুঝলুম, রাত হয়ে আসছে। আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে আমরা সূর্যচন্দ্র দেখে সময়টা কি এবং তার চেয়েও বড় কথা মানুষের আচরণ তার কাজ-কারবার

স্থির করি। যেমন সূর্য অস্ত যাচ্ছেন; অতএব এখন রাস্তার ভিড় কমতির দিকে। আর বিলেতে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখলেন রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। নিশ্চয়ই লাঞ্চের সময়, অতএব দুপুর।

ক্রমে ক্রমে রেস্তরাঁ ভর্তি হয়ে গেল। কি কি আশ্চর্য। সব গোরার পাল। একটি মাত্র ইণ্ডিয়ান নেই। চল্লিশ বছর পূর্বে টিলবারির রেস্তরাঁয় দেখেছিলুম বেশীর ভাগ সিলেটী খদ্দের; মাত্র দু'একটি গোরা। এখানে দেখি "সব্ লাল হো গিয়া।"

মালিক ওয়ার্ল্ড এট্লাসের মত বিরাট একখানা মেনু এগিয়ে দিয়ে বললে, "কি খাবেন, হুকুম দিন।" আমি বললুম, "প্লেনে বিস্তর ঝাঁকুনি খেয়েছি আর কি খাবো, কণ্ড। বমি করেছে বেশ কয়েকজন। তুমি আমি নিতান্ত সিলেটের লোক। জন্ম থেকে হাওর-বিলে নৌকর ভিতরে-বাইরে নাগর-দোলার দোল খেয়ে শিলঙ যাবার সময় আচমকা পাহাড়ী মোড়, হেয়ার-পিন টার্ন হজম করে করে সী সিক এ্যার সিক, ল্যাণ্ড সিক হইনে। কিন্তু এবারে আম্মো কাবু। গা গুলোচ্ছে, বমি না করলেই রক্ষে। প্লেনে ওঠার আগে যা-সব খেয়েছিলুম সেগুলো যেন রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল; এখন ফিরি ফিরি করছে। উপস্থিত থাক। বরঞ্চ খাটের পাশে দু'খানা স্যানউইচ রেখে দিয়ো। ক্ষিধে পেলে খেয়ে নেব।"

মেনুটার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, খেয়াল না করে, মালিককে ভদ্রতা দেখাবার জন্য, আলতো আলতো ভাবে। বিরয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা, চিকেনকারি গয়রহ গয়রহ। এ তো ডালভাত কিন্তু শব্দার্থে বলছি না। আই মীন, এগুলো তো এ-রকম ফেশনেবল রেস্তোরাঁতে থাকবেই। ইংরিজিতে যাকে বলে, "মাস্টস্"। কিন্তু কি একটা মামুলী আইটেমের দাম দেখতে গিয়ে আমি যেন আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বলে কি? দশ শিলিং! মানে? দশ টাকা। তখন মেনুর ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, সব মালেরই প্রায় ঐ দাম। অর্থাৎ, দু'পদী আহারাদির জন্য আপনার খসে যাবে পৌণ্ড খানিক। পনরো, বিশ, পঁচিশ টাকা! ও! তাই ইণ্ডিয়ানরা আসেনি। ওদের বেশীর ভাগই তো ছাত্রসম্প্রদায়। ওদের জেবে অত রেস্ত কোথায়?.....মনে পড়ল, চল্লিশ বছর পূর্বে ছ' পেনিতে (পাঁচ আনাতে) রাইসকারি পাওয়া যেত টিলবারি ডক্-এ!

পরে খবর নিয়ে শুনলুম, "গঙ্গার" ভাও মোটেই আক্রা নয়। এটাই নর্মাল। এমন কি, ঐ পাড়ার চীনা, হাঙ্গেরিয়ান, স্প্যানিশ রেস্তোরাঁতে আহারাদি আরো

আক্রা। আর, এরপর, খাস বিলিতি ডাঙর ডাঙর রেস্তোরাঁতে কি ভাও, সেটা শুধোবার মত হিম্মৎ আমার জিগর কলিজায় ছিল না, সেটা আমার হাফ-সিঙ্গল-চা, দুটো-ফল্‌স্‌ পীনেওলা বেরাদর পাঠক নিশ্চয়ই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। কোন্‌ দেশে কোন্‌ বস্তুর কি দর, "বিভিন্ন দেশের রেস্তোরাঁর তুলনাত্মক দরদাম" সম্বন্ধে ডকটেরেট থিসিস লিখে ধৈর্যশীল পাঠককে, এ-অধম নিপীড়িত করতে সাতিশয় অনিচ্ছুক। তবে কেন?

সেটা পরে হবে।

নটিংহাম

আমাদের ছেলেবেলায় ঘটি বাঙালে রেষারেষি ঠাট্টা-মস্করা ছিল ঢের ঢের বেশী। একটা মস্করা আমার মনে পড়ল নটিংহাম যাবার ট্রেনে বসে। বাঙালের সঙ্গে (বাঙাল "সাথে" বলে এবং গদ্যেও লেখে "সাথে"; রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে সেটা কিঞ্চিৎ অনিচ্ছায় স্বীকার করে নেন) লিলুয়া স্টেশনে দেখা এক ঘটির। বাঙাল শুধোলে, "কোথায় চললেন. দাদা?" ঘটি বললে, "চললুম, দাদা, পশ্চিমে। গায়ে এট্টুখানি গত্তি লাগিয়ে আসি।" বাঙাল আমেজ করলে, দাদা বুঝি হিল্লী দিল্লী বিজয় করতে চললেন। কারণ সে যখন প্রথম দেশ ছেড়ে শেয়ালদায় নামে তখন গান রচেছিল,

"লাম্যা ইশ্‌টিশানে
গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী মিয়ার রঙ-মহলে
ঢাহা (ঢাকা) জেলায় বশ্যাল (বরিশাল) ছাড়ি॥"

তার তরে বরিশাল ছেড়ে ঢাকা যাওয়াটাই একটা মস্ত কসরত। এবং শেয়ালদা আসাটা তো রীতিমত গামার সঙ্গে লড়াই দেওয়া!...অবশেষে ধরা পড়লো ঘটি দাদা যাচ্ছেন লিলুয়া।

সবই পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপার। লণ্ডন থেকে নটিংহাম সোয়া শ' মাইল হয় কি না হয়। আমাদের কাছে লম্বি। অথচ লণ্ডনের ইংরেজ দোস্তেরা যে ভাবে আমাকে ওখানে যেতে নিরুৎসাহ করছিলেন তার থেকে মনে হল ওরা ও-মুল্লুককে প্রায় দুশ্‌মনের পুরী বলে ধরে নিয়েছেন। একাধিক জন বললেন,

"ওখানে—অপরাধ নিয়ো না এই এই, অর্থাৎ সেখানে ইণ্ডিয়ানদের ঠ্যাঙানো হচ্ছে।" আমি বললুম, "যেতে যখন হবেই তখন অত ভেবে কি হবে। তদুপরি আমাদের পোয়েট টেগোর বলছেন,

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে॥"

ট্রেনে বসে চিন্তা করে দেখি, আমি নটিংহাম সম্বন্ধে যা জানি সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (১) আমার একজন আত্মীয় সেখানে আছেন। আমার আপন আত্মীয় হলে না গেলেও চলতো কিন্তু তিনি আমার ছোট বোনের দেবর। তিনি আবার তালেবর লোক। আমি যখন হামবুর্গে তখন কি করে কোথায় থেকে খবর পেয়ে তিনি নটিংহাম থেকে আমাকে ট্রাঙ্ক কল্ করে সাতিশয় অনুরোধ জানালেন, আমি যদিস্যাৎ ইংলণ্ডে যাই তবে অতি অবশ্য আমাকে নটিংহাম যেতেই হবে, যেতেই হবে—তিন সত্যি। (২) ছেলেবেলায় রবিনহুডের কেচ্ছা পড়েছিলুম। তাঁর কর্মস্থল ছিল নটিংহাম। পাশে ছিল শারউড বন। সেইটেই ছিল তাঁর স্থায়ী আস্তানা।...এদানির কলকাতার ছেলেছোকরারা আর রবিনহুডের কাহিনী তেমন একটা পড়ে না। কলকাতার গলিতে গলিতে এস্তের রবিনহুড। তবে অতি সামান্য একটা তফাৎ রয়েছে। রবিনহুড নাকি ডাকাতি করে যে-কড়ি কামাতো সেটা গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতো। অদ্যকার কলকাতার রবিনহুডরা চাঁদার নামে, হ্যানাত্যানার নামে যে-টাকা, প্রায়-ডাকাতি করে কামান, সেটা ঠিক ঠিক কোন্ জায়গায় যায়, এ-মূর্খ সে-বাবদে বিশেষজ্ঞ নয়। ঈশ্বর সুকুমার রায় তাঁর একটি কবিতাতে, "উপবেশন" কি করে করতে হয়, সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন,

"তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না পড়ে যেন কভু নিজ গালে।"

বাকিটা বলার কোন প্রয়োজন নেই। চালাক মাত্রই মূর্খকে কথা বলতে দেয়। আমি বিশ্বাস করি, "যদল্পং তন্মিষ্টং"। (৩) আমাদের যে-রকম বিদ্রোহী কবি শ্রীযুত নজরুল ইসলাম, ইংরেজের বিদ্রোহী কবি বায়রন। এবং তাঁর বাস্তুভিটে নটিংহামের অতি কাছে। ইংরেজ সরকার তাঁর মৃতদেহ বড় বড় মহৎ মহৎ কবির সঙ্গে লণ্ডনে গোর দিতে চায়নি বলে তাঁকে গোর দেওয়া হয় তাঁর বাস্তুভিটের গোরস্থানে।

"নটিঙম্! নটিঙম্!! নটিঙম্!!!" কলরব চিৎকার।

আরেকটু হলেই পৌঁছে যেতুম নর্থ পোলে। প্রফেটরা বার বার বলেছেন,

"নিজেকে চিনতে শেখো। আত্মচিন্তা করো।" তা আপনারা যত খুশী আত্মচিন্তা করুন। কিন্তু রেলগাড়িতে না। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে পৌঁছে, দু' ডবল ভাড়া, জরিমানা দিয়ে, মোকামে ফিরবেন বরঞ্চ সেইটেই চিন্তা করুন।

২

তনু, দেহ, শরীর, বপু, কলেবর কোন্‌টা ঠিক মধ্যিখানে বলা ভার। আমার আত্মীয় যিনি আমাকে নটিঙাম স্টেশনে রিসীভ করতে এলেন তিনি ঐ মধ্যিখানে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তাঁর ঢাউস মোটরগাড়ি। বাড়ি যাবার সময় অলস-নয়নে এদিক-ওদিক তাকালুম। ইংরেজ বিদেশে যদি বিশেষ কোনো নতুন চীজ না দেখতে পায় তবে বলে "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট।" অর্থাৎ এমন কিছু দেখিনি যা চিঠিতে লিখে বাড়ির লোককে তাক লাগানো যায়। আমার হল তাই। এক জায়গায় লক্ষ্য করলুম, পর পর দুটো দোকানে যেন কিছু ভারতীয় সামান-আসবাব আছে। শুধোলুম, "এ দোকানগুলো কাদের?" চৌধুরী বললেন, "এক শিখ ভদ্রলোকের। বেশ দু পয়সা কামান। বড়লোক বলা যেতে পারে।" চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছে দেখি তিনিও কিছু কম যান না। তেতলা বাড়িতে বাস করেন। তিনটেই তাঁর। তার পর গেলুম তাঁর রেস্তোরাঁ দেখতে। সেও এলাহি ব্যাপার। উপরের তলা নিচের তলা দু' তলা নিয়ে পেল্লাই কাণ্ড।

কিন্তু এ সব কথা অন্য দিন হবে।...খবরের কাগজে পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইংলণ্ডের বর্তমান সরকার আইন পাশ করতে যাচ্ছেন, এখন থেকে ওঁদের দেশে যেতে হলে কমনওয়েলথ নাগরিক—যেমন ভারতীয় পাকিস্তানী—এবং পাক্কা বিদেশী—যেমন ফরাসী জরমান—আর কোনো তফাৎ রইল না। বিগলিতার্থ: ভারত-পাকিস্তানীর পক্ষে এখন ও-দেশে গিয়ে দু পয়সা কামানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আত্মাভিমানী পাঠক হয়তো ঈষৎ রাগত কণ্ঠে শুধোবেন, "কী দরকার রে বাপু, বিদেশে গিয়ে এরকম হ্যাংলামো করার? কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আজ ঐ বাংলা দেশেই হাজার হাজার ছেলে—এবং মেয়েও আছে যারা বিলেত, বিলেত কেন হটেনটটের মুল্লুকেও যেতে রাজী আছে পেটের ভাতের তরে। এতে অভিমান করার কী আছে?...কিন্তু সেই কথায় ফিরে যাই। নটিঙামে গিয়েছিলুম গেল বছরের সেপ্টেমবর মাসে। সেখানে গিয়ে শুনি, ওরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে, নতুন কনজারভেটিভ সরকার কোন্ তালে আছেন। বিশেষ করে সিলেটিরা আমাকে তাদের দুশ্চিন্তার কথা

শোনাতে গিয়ে বললে, "দেশ থেকে নতুন লোক যে আর আসতে পারবে না, শুধু তাই নয়, হুজুর। দেশে যাওয়া-আসা যে প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের বেশীর ভাগেরই বউ-বাচ্চা তো ওখানে।" আমি বললুম, "আচ্ছা, এখানে তো ভারতের লোকও রয়েছে। তাদের সঙ্গে 'পরামিশ-সুপারিশ' করে দেখেছ? উভয় পক্ষের বিপদ তো একই।" উত্তরে যা বললে সেটা, পাঠক, একটু মন দিয়ে শুনুন। বললে, "হুজুর ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক বনে না। ওদের বেশীর ভাগই শিখ। ওরা হিন্দুস্থানী বলেই যে আমাদের সঙ্গে বনে না সেটা ঠিক না—বিশ্বাস করুন হুজুর। আপনিও তো হিন্দুস্থানী। আপনাকে তা হলে এ সব দরদ জানাই কেন? ছুটিছাটায় যখন লণ্ডন যাই, তখন পূব-পচ্ছিম দুই বাংলার লোকের সঙ্গেই দেখ-ভাল মোলাকাৎ-মহব্বৎ হয়—হিন্দু-মুসলমান দুইই। তারার লগে কথা কইতে কুনু অসুবিস্তা অয় না, তারা আমরার দুশকো (দুঃখ) বুঝে, আমরাও তারার দুশকো বুঝি। আর এই শিখদের সঙ্গে আমাদের আরেকটা ডাঙর ফারাক আছে। ওরা এদেশেই বসতি গাড়তে চায়, দেশে ফিরে যেতে চায় না। তাই তারা দেশের গাঁয়ে টাকাকড়ি পাঠায় না। আর আমাদের পনরো আনা দেশে ফিরে যেতে চায়। তাই আমরা দেশে টাকা পাঠাই—যাতে করে দেশের ভাই-বেরাদর সুখে থাকে, পুরানো বাড়ি-ঘরদোর মেরামতীতে রাখে, নয়া উমদা বাড়ি বানায়। আর দেশে টাকা পাঠানোতেও বিস্তর মুশকিল। ব্যাঙ্কের মারফতে পাঠালে দেশের লোক পাবে কম, কালো বাজারে—"

বাকিটা আমি শুনিনি।...আমি মনে মনে ভাবছিলুম (১) বাঙালী বাঙালীতে কী প্রণয়! (২) বাঙালী দেশকে বড্ডই ভালবাসে। এই নটিঙামের বাঙালী মুসলমান—তার প্রাণ-জিগর-কলীজা পড়ে আছে সিলেটে।

হাওর

বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস লেখেন জনৈক মোল্লা নাথন, নাথতু। বইখানার নাম বহার-ই-স্তান-ই-গায়েবী অর্থাৎ 'অজানা চির বসন্ত ভূমি'—ফার্সীতে লেখা। নাথু মিঞা দিল্লীর লোক। ভাগীরথী পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি এমন কোন 'ঘাশ' দেখেননি যেখানে ঘোরতর গ্রীষ্মকালেও ঘাস সবুজ থাকে। তাই কেতাবের নাম দিয়েছিলেন "চির বসন্ত ভূমি"। মিঞা সাহেব এসেছিলেন 'বাংলা দেশে' জাহাঙ্গীরের রাজ সেনানীর সঙ্গে শেষ পাঠান রাজা ওসমানকে

পরাজিত করার জন্যে। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবর বাদশাহ পুরো বাংলা দেশ জয় করতে পারেননি। তার একমাত্র কারণ মোগলরা শুকনো দেশের লোক; নৌযুদ্ধ কারে কয় জানে না। জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি বেশীর ভাগ ভয় দেখিয়ে কিছুটা ঘুষ দিয়ে কয়েকটি মীরজাফর যোগাড় করে নৌযুদ্ধ খানিকটা শিখল। তার পর তারা ওসমানের পিছনে ধাওয়া করল। ওসমানের প্রধান দুর্বলতা ছিল যে তার কাছে যে সব কামান বন্দুক ছিল, সেগুলো মোগলদের তুলনায় নিকৃষ্টতর। তদুপরি জাহাঙ্গীরের সেনাপতি যে প্রচুর সৈন্যদল নিয়ে এসেছিলেন তার সামনে দাঁড়ানো ওসমানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

ঐ সময়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর চিঠি লিখলেন ওসমানকে: আত্মসমর্পণ করো। ওসমান অতি সংযত ভদ্র ভাষায় উত্তর দিলেন, যার মর্মার্থ, আপনি দিল্লীশ্বর, আপনার দেশ-দেশব্যাপী বিরাট রাজত্ব। আমি তো তার তুলনায় সামান্য একটি চিড়িয়া। কিন্তু সামান্যতম পাখিটিও স্বাধীন ভাবে থাকতে চায়।-- ওসমান জানতেন মোগলরা এতদিনে বেশ কিছুটা নৌ-যুদ্ধ শিখে নিয়েছে। তদুপরি সেটা শীতকাল (ইয়াহিয়া খানের কপাল ভালো যে শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ঝগড়াটা চরমে পৌঁছায় মার্চ মাসে; বর্ষা নামলেই চিত্তির। তাই তিনি তিলব্যাজ না সয়ে মারলেন তাঁর হাতুড়ি ঐ মোকাতেই)। তাই তিনি স্থির করলেন মোগলদের নিয়ে যেতে হবে সিলেটে। সেখানে যে সব হাওর আছে তার প্রধান ভাগ শীতকালেও শুকোয় না। কারণ বৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধতম স্থল চেরাপুন্‌জী। তার কুল্লে পানি নেবে আসে সিলেট জেলায়, ডাউকি হয়ে জইন্তা হয়ে—অসংখ্য নদনদী খাল নালা দিয়ে। এই সব হাওরে সামান্যতম ঝড় উঠলে ঐ দেশেরই বহু কিশোর তরুণ তক বমি করতে থাকে—অর্থাৎ বাংলা কথায় সী-সিক হয় (পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে 'ডীডে' ল্যাণ্ডিঙের সময় প্রচুর সৈন্য নরমাণ্ডির বেলাভূমিতে নেমে সেখানে শুয়ে পড়ে। বমি করতে করতে তাদের পেটে তখন আর কিছু ছিল না যে লড়াই করে করে জরমনদের ঘাঁটি দখল করে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, এন আমি মার্চেজ অন ইটস স্টমাক। অন্যার্থে। কিন্তু এস্থলে এটা প্রযোজ্য)। এবং ঢাকা থেকে সিলেটের হাওর অবধি একেবারে ফ্ল্যাট। সিলেট পৌঁছলেই আরম্ভ হয় টিলা, কোনো কোনো টিলাকে পাহাড়ও বলা যেতে পারে। ঘন বন জঙ্গল এবং প্রচুর সুপুরি গাছ।...ওসমান তাই পৌঁছলেন সিলেটে। 'রিয়ার গার্ড একশন' করতে করতে। অর্থাৎ তিনটে সুপুরি গাছ জড়িয়ে বেঁধে তার সর্বোচ্চতম প্রান্তে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে সেখানে কামান তুলে নিয়ে দুশমনের উপর কামান দাগতে দাগতে। মিয়াদের তখন তাজ্জব নয়া অভিজ্ঞতা

হল। করে করে ওসমান সিলেট জেলার প্রায় আধখানা পেরিয়ে মিয়াদের নিয়ে গেলেন, আজ ম্যাপে যেখানে মৌলবী বাজার, তার তিন মাইল দূরে দুল্লভমপুরে (অধুনা নাম দুর্লভপুর)। তারই পরে হাইল হাওর। ওসমান ও তাঁর সৈন্যদল হাওরের হাঁটুজলে পায়ে হেঁটে ওপারে চলে গেলেন। তিনি জানতেন, মোগলরা এ অঞ্চল কখনো আসেনি। তারা জানে না, কোন জায়গায় হাঁটুজল আর কোন্ কোন্ জায়গায় অথৈ জল। মোগলরা এপারে দাঁড়িয়ে।...তারপর শুভ লগ্নে ওসমান ওপার থেকে হাওর পেরিয়ে আক্রমণ করলেন—মোগল সৈন্যদের। তারা লড়েছিল প্রাণপণ। কিন্তু পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে তারা পালাতে আরম্ভ করলো। এমন সময় হাতির-পিঠে-বসা অগ্রগামী ওসমানের চোখে এসে ঢুকলো একটা উটকো তীর। মাহুত ভয় পেয়ে হাতি ঘোরালো। ওসমান বুঝতে পেরে চেঁচাচ্ছেন, এগিয়ে চলো চলো। ওদিকে মোগল সৈন্যদের ভিতর বিজয়ধ্বনি আরম্ভ হয়েছে—'ওসমান পালাচ্ছে, ওসমান পালাচ্ছে।' মোগলরাই জয়ী হল। সে এক করুণ কাহিনী। সুযোগ পেলে আরেকদিন সবিস্তর বলব।

কিন্তু আমি জালা জালা পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটছি কেন? যারা বাংলা দেশ থকে আসছেন, তাঁরাই বলছেন গেল সাড়ে দুই মাস ধরে সব চেয়ে মোক্ষম লড়াই দিয়েছে—সিলেটের লোক। তাদের কি সুবিধে—টিলাবন হাওর—অর্থাৎ 'তেরাঁ'—পূর্বেই বলেছি।

ওসমান যুদ্ধে হারেন শীতকালে মার্চ মাসে। এবারে দেখি ঘন বরষায় তারা হাওরের কি সুযোগ নেয়।

এপিলোগ: আকবর বাদশা মারা যান আমাশাতে। বাংলা বিজয় অভিযানে বেহারে। সে আবার আমাশা! ঢাকার আমাশা অলিম্পিক। পিণ্ডির জাঁদরেল যে এই বর্ষায় ঢাকায় আসছেন, তাঁর যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায়! সম্পাদক মহাশয়, আপনি সহৃদয় লোক। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, পিণ্ডির খান সাহেবকে জানিয়ে দিতে, প্রতিদিন দুটো এনটেরো ভায়োফর্ম এবং এক বড়ি ত্রিফলাকস, তদভাবে ইসপগুল তিনি যেন সেবন করেন। যদি তিনি এ যাত্রায় নিস্তার পান তবে ইতিহাস হয়ত আপনার প্রতি কটুকাটব্য করবে। সাধু সাবধান।

মহাভারত

পয়লা ফেব্রুয়ারি দিবস, কলকাতার এশিয়্যাটিক সোসায়েটির বার্ষিক সম্মেলনে লাটসাহেব শ্রীযুত শান্তিস্বরূপ ধাওন যা বলেন তার বিগলিতার্থ—আমি তিনখানা খবরের কাগজের রিপর্টের উপর নির্ভর করে আমার নিবেদন জানাচ্ছি—এতাবৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতের তথা ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা (ইণ্টারপ্রিট) করেছেন তাঁদের পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিবিন্দু ("উয়েসটার্ণ আইজ") দিয়ে। এখন আমাদের—ভারতীয়দের—উচিত, ভারতীয় সভ্যতা (শ্রীযুত ধাওন "সভ্যতার"—সিভলিজেশন-এর সঙ্গে 'কালচার' বলেছিলেন কি না সেটা খবরের কাগজ উল্লেখ করেনি। এটা গুরুত্বব্যঞ্জক। কারণ যে কোনো একটা জাতি, দেশ, নেশন অতিশয় সিভিলাইজড না হয়েও কালচার, বৈদগ্ধ্যের উচ্চাসন গ্রহণ করতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি শ্রীযুত ধাওন দুটোই বলতে চেয়েছেন) ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অজানা নয় যে, যবে থেকে ইংরেজ আপন স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষে এসেছে সেই থেকেই এ দেশের নিন্দাবাদ করেছে। গোড়ার দিকে মৃদুকণ্ঠে, মোলায়েম মোলায়েম ভাবে। পরে যখন বণিকের মানদণ্ড পুরোপাক্কা রাজদণ্ডে পরিণত হল তখন ভারত বাবদে তার অন্যতম প্রধান "কর্তব্য" হয়ে দাঁড়ালো বিশ্বজনের সামনে সপ্রমাণ করা: ভারতবর্ষ অতিশয় অশিক্ষিত, অসভ্য, অনকলচরড দেশ এবং এ দেশকে সভ্য ভদ্র সত্যধর্মে-খৃষ্টধর্মে-দীক্ষিত করার জন্য ইংরেজ নিতান্ত পরোপকারার্থে, প্রতি খৃষ্টজনের যা কর্তব্য, অর্থাৎ বর্বরদের সভ্য করার জন্য এ দেশে এসেছে, এবং এই পাষণ্ড, নেমকহারাম দুশমনের কলকাতা শহরের জলাভূমির আমাশা, নানাবিধ জ্বর রোগে সাতিশয় ক্লেশ "ভুঞ্জিয়া" সদাপ্রভুর পদপ্রান্তে আপন আত্মা নিবেদন করছে, সেক্রিফাইস করছে, এক কথায় মার্টার বা শহীদ হয়েছে। এই যে ইংরেজের দম্ভোলিদম্ভ—এরই ঘৃণ্য ভণ্ডনাম "হোয়াইট মেনস বার্ডেন"। তদর্থ, গড ধবলাঙ্গদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন শ্যামাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, রক্তাঙ্গ (রেড ইণ্ডিয়ান), পীতাঙ্গ পৃথিবীর কুল্লে জাতকে "শিক্ষিত সভ্য" করার গুরুভার (বার্ডেন) আপন স্কন্ধে তুলে নেয়। এ বার্ডেন বইতে গিয়ে ইংরেজাদি শ্বেতাঙ্গদের কি পরিমাণ মুনাফা হয়েছে সে তত্ত্ব আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। "থী মেন ইন এ বোট"-এর প্রখ্যাত রসাচার্য ভারতপ্রেমী লেখক জরৌম কে জরৌম এই বার্ডেন

ভণ্ডামিকে তীব্রতম ভাষায় ব্যঙ্গ করে এই শতকের গোড়ায় একটি প্রবন্ধ লেখেন: "হোয়াইট মেনস বার্ডেন—হোয়াই শুড ইট বী সো হেভি?"—কিংবা ঐ ধরনের। তিনি নানা প্রকারের ঠাট্টামসকরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ সারার পর বক্রোক্তি করেন, হোয়াইট মেনস বার্ডেন বইতে গিয়ে আমরা যে আত্মত্যাগ, পরার্থে প্রাণ দান করলুম তাতে করে আমাদের কি ফায়দা হয়েছে? এই নেমকহারাম ইণ্ডিয়ানরা (বলা বাহুল্য, ইংরেজের "আত্মত্যাগ", ভারতীয়ের 'নেমকহারামী' জরৌম আগাপাশতলা উল্টো বুঝলি রামার্থে নিয়েছেন) যদি আমাদের বার্ডেন বওয়ার মূল্য না বুঝে এখন নিজের বার্ডেন নিজেই বইতে চায় (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন জোরদার—জরৌম তার প্রতি অনুরাগী) তবে ফেলে দে না, বাবা, ঐ মূর্খদের স্কন্ধে ওদের আপন বার্ডেন। চলে আয় না ওদেশ ছেড়ে। বয়ে গেছে আমাদের!

এ তো গেল। ওদিকে আরেক শিরঃপীড়া। ইংরেজের বাক্যরীতিতেই বলি, সে একাই তো বেলাভূমিতে একমাত্র উপলখণ্ড নয়। আরো মেলা চিড়িয়া রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি।"'

এস্থলে দেখা গেল ইতিমধ্যে ইয়োরোপের অন্যান্য জাত ভারতের অনেক অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ—অবশ্য অধিকাংশ অনুবাদে—পড়ে ফেলেছে। দারাশীকুহ-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ কিংবা তাঁর আদেশে কৃত অনুবাদ ('মুজমা'-ই-বহরেন'—'দ্বিসিন্ধু মিলন') লাতিনে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজ পড়লো বিপদে। উপনিষদ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। তার ফার্সী অনুবাদ করলো এক মুসলমান। তার লাতিন অনুবাদ করলো এক খৃষ্টান পাদ্রি এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইলো সেদিনকার—সর্বোত্তম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না—সর্বসংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক শোপেনহাওয়ার।

ইতিমধ্যে, শেক্‌সপীয়রের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নাম অনেকেই করে থাকেন সেই কবি গ্যোটে শকুন্তলা নাট্যকে প্রশংসা প্রশংসায় স্বর্গে তুলে দিয়েছেন—না, ভুল বললুম,—তিনি বললেন, এই নাট্যেই স্বর্গ এবং পৃথিবী সম্মিলিত হয়েছে।

ইংরেজ জাত ঘড়েলস্য ঘড়েল। সে সুর পালটালে। অবশ্য আমার বক্তব্য এ-নয়, যে নিরপেক্ষ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কোনো ইংরেজ কস্মিনকালেই ছিল না। কিন্তু কে পরোয়া করে তাদের?

তাই আজ যখন প্রশ্ন উঠেছে, মহাভারত কাল্পনিক না ঐতিহাসিক তখন ইংরেজ পণ্ডিতেরই বরাত দেওয়া প্রকৃষ্টতম পন্থা। উওশবর্ন হপকিনস তাঁর

একাধিক প্রামাণিক গ্রন্থে বলেছেন (যে কারণে, অধমের জানা মতে, ধর্ম বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট এনসাইক্লোপীডিয়ায় তিনি মহাভারত সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ রচনা করার জন্য সম্মানিত আমন্ত্রণ পান), "নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মহাভারত কাব্যে কোনো সত্যকার সংঘর্ষ প্রতিবিম্বিত হয়েছে—"ইট্ (মহাভারত) অনডাউটেডলি রিফলেক্ট্স সম্ রিয়েল কনটেসট"। পুনরপি তিনি বলছেন, সত্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আমরা যদি পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশসমূহের তালিকা (লিস্টস্) মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে পাই যে মহাভারতের নানা প্রকারের কিংবদন্তির পশ্চাতে সত্য ইতিহাস বিম্বিত হয়েছে। স্বর্গত গিরীন্দ্রশেখর ঠিক এই মতটিই তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেছেন ; এ-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার উল্লেখ হয়েছে।

সব থাক্, সব যাক্। পাঠক, তোমার কমনসেনস কি বলে ? কোনো কিছু ঘটেনি, কোনো কিছু হয়নি, এ যেন হাওয়ার-কোমরে দড়ি বাঁধা !

ঠিক তেমনি, খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু পাওয়া যায়নি বলে সব ঝুট হ্যায় ? তবে একটি "ছোটাসী চুটকিলা" পেশ করি। এক রেড ইণ্ডিয়ান বললে তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বেরিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের টেলিগ্রাফের তার। অতএব সে-যুগেই তারা টেলিগ্রাফি জানতো। উত্তরে এসকিমো বললে, তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনো প্রকারের তার পাওয়া যায়নি। অতএব তারা বেতার ওয়্যারলেস ব্যবহার করতো।

কিন্তু আমার শিরঃপীড়া ভিন্ন। মহাভারতের মত কোনো গ্রন্থই বারবার পুনর্বার আমি পড়িনি। অথচ প্রতিবার নব নব সমস্যা দেখা দেয়। সে কথা আর এক দিন হবে।

৫৭০-১৯৭০/১৪০০ বৎসর

হজরৎ মুহম্মদ (দ)-এর চতুর্দশ জন্মশতবার্ষিকী

হজরতের জন্মদিন নিয়ে বিস্তর আলোচনা, সবিস্তর তর্কাতর্কি মোটামুটি এই চোদ্দশ' বছর ধরে চলছে, এবং চলবেও।

আজ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। আরবী চান্দ্র মাসের গণনায় আজ রবীউল্ আউওল মাসের ১২ তারিখ। দ্বাদশ শব্দের ফার্সী : দোওয়াজ-দহম্। দো = দ্ব = দুই ; দহম্ = দশম্ = দশ। অর্থাৎ দ্বিদশ। বলা হয়, হজরৎ মুহম্মদ এইদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই চান্দ্রমাস রবীউল্ আউয়ল্-এর বারো

তারিখকে বলা হয়, ফৎহ্-ই-দো ওয়াজ্‌দহম্। দোওয়াজ্‌দহম্ শব্দের অর্থ এই মাত্র নিবেদন করেছি। ফৎহ্ শব্দের অর্থ জয়। এই আরবী শব্দটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। শিখেরা "গুরুজীকী ফতেহ্" জয়ধ্বনি করেন; বাদশা আকবর নির্মিত ফতেহ্‌পুর সীক্রী অনেকেই দেখেছেন।

কবি মরহুম গোলাম মোস্তফা তাঁর "বিশ্বনবী" গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সুপণ্ডিত মরহুম মওলানা মোহম্মদ আকরম খান তাঁর "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে বিস্তর গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেছেন, হজরতের জন্ম হয়, ৯ই রবীউল আউওল; ১২ই নয়।

কিন্তু বাঙলা দেশের জনসাধারণ, তথা উভয় বাঙলার সরকার মেনে নিয়েছেন যে হজরতের জন্ম হয় ১২ তারিখে। কিন্তু সেটা চাঁদ দৃশ্যমান হবার উপর নির্ভর করছে। কাজেই কেউ কেউ ১৮ই মে, অন্যেরা ১৯ মে হজরতের জন্মদিবস (ঈদ্-ইদ-মিলাদ্-উন্-নবী; ঈদ্ = আনন্দদিবস, মিলাদ = জন্মক্ষণ—ও-ল-দ ধাতুর অর্থ "জন্ম দেওয়া", তার থেকে মওলিদ্, মিলাদ্, মওলুদ্ অনেক শব্দই প্রায় একই অর্থে এসেছে, এমন কি আরবের খৃষ্টানরা বড়দিনকে বলেন "ঈদ্ উল্ মিলাদ্"—তাই পাঠক নির্ভয়ে আজকের পরবকে "মিলাদ্ শরীফ"—শরীফ = উচ্চ, সম্মানিত, ভদ্র—"মওলুদ শরীফ", "ঈদ্-ই মিলাদ" যা খুশী বলতে পারেন। কিংবা পূর্বোল্লিখিত আরবী ফার্সীর সংমিশ্রণে ফৎহ্-ই-দোওয়াজ্‌দহম্‌ও বলতে পারেন।

নবী, পয়গম্বর, রসুল ইত্যাদি শব্দ একই ব্যক্তি, অর্থাৎ হজরৎকে বোঝায়।

হজরতের জন্মদিন নিয়ে দেশের জনসাধারণ যা মেনে নিয়েছেন আমরাও তাই মেনে নিলুম। এখন প্রশ্ন তাঁর জন্ম কোন্ বৎসরে?

কেউ বলেন ৫৬০ খৃষ্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৬২ খৃষ্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দ।

মোদ্দা কথা এই;—যখন কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তখন তো মানুষ জানে না, তিনি একদিন মহাপুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। তদুপরি হজরৎ জন্মগ্রহণ করেন বিত্তহীন অনাথের গৃহে। সে-কালে মক্কা শহরে লেখাপড়ার খুব একটা চর্চা ছিল না (হজরৎকে লেখাপড়া শেখবার কোনো চেষ্টা তাঁর বাল্যবয়সে করা হয়নি; বস্তুত তিনি নিরক্ষর ছিলেন)—কে লিখে রাখবে তাঁর জন্মদিন?

এটা শুধু হজরতের বেলায়ই নয়। বুদ্ধদেব, মহাবীর, জরথুস্ত্র, খৃষ্ট এঁদের সকলেরই জন্মদিবস এমন কি জন্মবৎসর নিয়েও পণ্ডিতেরা আদৌ একমত নন।

হজরতের পরলোকগমন দিবস সম্বন্ধে কোনো মতানৈক্য নেই। তিনি মরধাম

ত্যাগ করেন ৭ই জুন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে। এবং হিজরী তারিখ অনুযায়ী ১২ই রবী উল্-আউওল। অর্থাৎ তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই দিবসে। এতে ভক্ত মুসলমান মাত্রই আল্লাতালার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেত দেখতে পান।

পূর্বেই নিবেদন করেছি হজরতের জন্মবৎসর ৫৬০, ৫৬৯, ৫৭০ বলা হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকেই ইস্কুলে পড়েছি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। সেই জনমতই আমরা আবার মেনে নিলুম। এখন যাচ্ছে ১৯৭০। তাহলে এই বৎসর, এই মাসে, এই দিনে হজরতের ১৪০০ জন্মদিন। তাই বহু মুসলমান এদিনটিকে বিশেষ সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ মতভেদের সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের বৎসর গণনা চন্দ্র নিয়ে। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে হ্রস্বতর। তদুপরি গণনাতে আরেকটা অসুবিধা আছে। মুসলমানের বৎসর হিজরী, গণনা আরম্ভ হয় জুলাই ১৬, ৬২২ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তার পূর্বে আরবরা বৎসর গণনা করতো সৌর বৎসরে। হিসেব তাই কঠিনতর হয়ে যায়। এবং সর্বশেষ বিপদ, যে খৃষ্টান ক্যালেনডার নিয়ে আমরা সন তারিখ গণনা করি তারও পরিবর্তন সংস্কার একাধিকবার হয়েছে।

অতএব এ-সব হিসেব আপনার আমার মত সাধারণ জনের কর্ম নয়। আমরা সরল বিশ্বাসী। ইস্কুলে পড়েছি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। আজ তাঁর জন্মদিন। এবং উপস্থিত ১৯৭০। অতএব আজ তাঁর ১৪০০ বৎসরের জন্মদিন। আজ আনন্দের দিন। ঈদের দিন। মুসলমান হিন্দু, খৃষ্টান, জৈন, (মারওয়াড়ি) সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হয়।*

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষের সর্বত্র যে রূপে প্রকাশ পায়, বাংলাদেশে সে রূপ গ্রহণ করে না। উত্তর ভারতের অন্যত্র হিন্দুরা হিন্দী বলেন পড়েন, মুসলমানরা উর্দুর সঙ্গে যুক্ত। তেজবাহাদুর সপ্রু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জাতীয় উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এককালে বিহারে বহু মুসলমান হিন্দী শিখিতেন; শুনিতে পাই, তাঁহারাও নাকি হিন্দী বর্জন আরম্ভ করিয়াছেন।

---

* এই সামান্য লেখনটি লেখার উদ্দেশ্য: বহু হিন্দু এবং অনেক মুসলমান হজরতের জন্মদিন, পরলোকদিবস সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল নন বলে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করেন। পণ্ডিতরাই যে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি, সে-স্থলে আমাদের অযথা কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসী—তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমান হউন বাংলা বলেন ও পড়েন। কাজেই ভাষার কল্যাণে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে চিনিবার সুযোগ পায়। মিশরে কপ্ট-রা ক্রীশ্চান ও বাদবাকী বাসিন্দা আরব মুসলমান। কিন্তু উভয়ের ভাষা এক বলিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিলনের সুবিধা হইয়াছে। প্যালেস্টাইনে নবাগত ইহুদীরা হয় ইউরোপীয় কোন ভাষা বলে নতুবা মৃতপ্রায় ইয়েডিশ ভাষাতে। কলহ লাগিয়াই আছে।

বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টি-সভ্যতা সাধারণ বাঙালী হিন্দু যতটুকু (পরিতাপের বিষয় সে ধূলপরিমাণে) জানেন ইচ্ছা করিলেই ততটুকু অক্লেশে জানিতে পারেন ও অনেকেই জানেন। সাধারণ বাঙালী হিন্দু যেটুকু বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-ভাগবত, ষড়দর্শন, কাব্য-নাটক পড়েন, তাহা বাঙলা অনুবাদে ও বাদবাকী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, রামপ্রসাদী, পরমহংসদেবের রচনামৃত তো মূল বাঙলাতেই আছে। ফলিত-গলিত জ্যোতিষের জন্য বিরাট পঞ্জিকা আছে। বলিতে কি, গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা বেদ-উপনিষদ গীতাকে হার মানাইয়াছে। আশ্চর্য হইবারই বা কি আছে? ভবানীকে যখন মহাকাল এক বৎসরকালের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া শুধু ঐ বৎসরেরই ফলাফল নিবেদন করেন, তখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে কোন্ নাস্তিক? আমরাও করি না। বস্তুতঃ সরকারী আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা ক্ষণা দেবীর উপর অন্ততঃ আমার বিশ্বাস ভরসা বেশী।

সে যাহাই হউক। আসল কথা এই যে, অনুবাদ সাহিত্যে বাঙলা এখন এতটা সমৃদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা সাধারণ বাঙালী নিজেকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখিতে পারেন। বাঙালী মুসলমানও এই সাহিত্য হইতে অনেক কিছু পারেন। উপায় নাই। এই সব অনুবাদ, মূল বৈষ্ণব পদাবলী, মেঘনাদ বধ কাব্য, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি বাদ দিলে প্রাক্ রবীন্দ্র-সাহিত্যে রইল কি?

এখন প্রশ্ন, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের অথবা হিন্দুর দ্বারা লিখিত মুসলমানী সাহিত্যের কতটা খবর রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন?

বাঙালী হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তাহার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোন মুসলমান শরৎবাবুর মত সরল ভাষায় মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন্ হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন। আরব্যোপন্যাসের বাঙলা তর্জমা এখনও হাজার হাজার বিক্রয় হয়—যদিও তর্জমাগুলি অতি জঘন্য

ও মূল আরবী হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই। আবু সঈদ আইয়ুবের লেখা কোন্ বিদগ্ধ বাঙালী অবহেলা করেন? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানী কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালী কবীরকে কে না চিনে?

মুসলমানদের উচিত কোরাণ, হদীস, ফিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবনে হিশামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থপতি শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবনে খলুদন), দর্শন কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি কত বলিব—সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফার্সীতে লিখা বাঙলার ভূগোল ইতিহাস বাহার-ই-স্তানে গাঈবীর বাঙলা তর্জমা এখনও কেহ করেন নাই।

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচর' বিভাগ আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানা রকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ব বিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন? লিখিলে কি উজবেকীস্থানের ভাষায় লেখেন?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষায় বলেন; কিন্তু একই বই পড়েন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি গিরিশবাবুর কোরানের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ছিল; কারণ মুসলমানরা তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই যে, কোরানের বাংলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশারফ হুসেন সাহেবের বিষাদসিন্ধু বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবী-ফারসী শব্দযোগে তাঁহাদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তারপর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালী হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন; এমন কি উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জন বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহীদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, "কানান" কোথায় জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজী সাহেব তাঁহার ধূমকেতু কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতিমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিলেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলি পড়িয়াছেন। এখনও মাসিক মোহাম্মদীতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু মোহাম্মদী কিনেন না; বিশেষতঃ পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবী মনসুরউদ্দীনের 'হারামণিতে' সংগৃহীত মুসলমানী আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

২

সর্বজাতি-ধর্মবর্ণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবে ও সেই সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর মধ্যে স্থায়ী আসন লইয়া সত্য ও ধর্মের পথে চলিবে, কংগ্রেসের ইহাই মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে কংগ্রেস কখনও বিশ্বাস হারাইবে না, ও আজ যদি কোনো বিশেষ বর্ণকে নির্যাতন করিয়া অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বলি দিয়া কংগ্রেস স্বরাজ পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তবুও তাহা গ্রহণীয় মনে করিবে না।

উপস্থিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাজনৈতিক চিন্তাধারায়' বলিতেছি, কারণ আপামর জনসাধারণ এই সমস্যা দ্বারা কতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহার পরিমাণ দ্বিধাহীনরূপে আমাদের কাছে এখনও প্রকাশ পায় নাই।

মুসলমানদের কোন কোন নেতা বলেন, 'আমাদের ধর্ম পৃথক, আমাদের আদর্শ পৃথক, আমাদের অনুভূতির জগৎ পৃথক, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই পৃথক, এক কথায় আমরা আলাদা জাতি বা নেশান।'

কংগ্রেস ইহা স্বীকার করেন না; বহু মুসলমানও করেন না। প্রায় সকল বিদেশী মুসলমানও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তুর্কী মুসলমানেরা। তাবৎ প্রাচ্য শক্তিরই বাসনা যে, ভারতবর্ষের সর্বজাতি মিলনের ফলে উপজাতি মহতী শক্তিই প্রাচ্য তথা বিশ্বের মঙ্গল আনয়ন করিবে।

হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক নেশন কি না তাহা দুই দৃষ্টিবিন্দু হইতে দেখা যাইতে পারে। এক, হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিত চিন্তা অনুভূতি ও জীবনীধারার পার্থক্যের হিসাবনিকাশ করিয়া মীমাংসা করা, তাহারা দুই পৃথক নেশন কি না;

অথবা (দুই) ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া সিংহাবলোকন করা,—অর্থাৎ ইতিহাস কি এই সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সাহায্য-বর্জিত স্বকীয় বিশেষ কৃষ্টি, ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া আপন নেশনত্ব উপভোগ করিতে-ছিলেন ; আপন ভুবনে বাস করিতেছিলেন ? ইংরাজ যে রকম আজ এই দেশে দুই শত বৎসর কাটাইয়াও আপন ভাষায় কথা বলে ; আপন আহার করে ও করি-বার সময় দেশের 'হ্যাম-বেকনের' স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ; আপন সঙ্গীত দেশের লোকের কর্ণকুহর প্রপীড়িত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গায়, এ দেশের প্রখর আলো উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার চিত্তে তাহার অন্ধকার দেশের মানানসই তীব্র বর্ণযুক্ত ওয়েলপেন্টিং দ্বারা এদেশের প্রাচীর প্রলেপন করে, অবকাশ পাইলেই উর্ধ্বশ্বাসে কালবিলম্ব না করিয়া 'হোম' ছোটে, নয়াদিল্লীতে শিরঃপীড়া ও হৃদিত্রাস সঞ্চার স্থাপিত সৃষ্টি করে ; নগরীর যত্রতত্র বেমক্কা মানুষকে ঘোড়ায় বসাইয়া 'প্রতিমূর্তি' নির্মাণ করে ; যতদূর সম্ভব আপন 'কাস্ট ক্লব' করিয়া দেশের সামাজিক জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে ; ও বিশেষ প্রাত্যহিক নিত্যকর্ম এমন ভাবে করে যে, তদ্দর্শনে তাবৎ ভারতবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সচকিত হয়। নিন্দা করিতেছি না—পার্থক্য দেখাইতেছি মাত্র।

স্বীয় উক্তিতে মুসলমানরা নিজেকে যত পৃথকই ভাবেন না কেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা সায়েবদের মত 'পাণ্ডববর্জিত' পার্থক্য ধরেন না।

পার্থক্য আছে এবং অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত সম্মিলিত সাহিত্য-কাব্য-ধর্ম প্রচেষ্টাও আছে। প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টি দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দুইটির বিচার করা কর্তব্য। তৎপর দ্রষ্টব্য, ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীণ মিলনের জন্য কোন্ আনন্দলোকের দিকে দিঙনির্ণয় করে।

ধর্মে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য আছে—অনৈক্য আছে কি না, তাহা পরে বিচার্য। ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুর মত উদার জাতি পৃথিবীতে আর নাই। হিন্দু বহু দেবতা মানিতে পারে, নাও মানিতে পারে ; উপনিষদের আত্মন ব্রহ্ম একাত্মা-নুভূমিতে তাহার মোক্ষের সাধন করিতে পারে, নাও পারে, গীতার পরমপুরুষকে উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবনের রসরাজকে হৃদয়আসনে বসাইতে পারে, নাও পারে ; সর্বভূতে দেবীকে শান্তিরূপে দেখিতে পারে, নাও পারে ; পূর্বজন্ম পরজন্ম মানিতে পারে নতুবা স্বর্গনরকে বিশ্বাস করিতে পারে অথবা উভয়ের সম্মিলনও করিতে পারে। এক কথায় হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সঙ্গবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডীবদ্ধ নহে। কিন্তু তবু আমরা অনায়াসে দৈনন্দিন জীবনে জানি—কাহার ধর্মবিশ্বাস হিন্দুর ন্যায়, কাহার নহে।

মুসলমানরা ধর্মবিশ্বাসে কঠোর নিয়মের বশবর্তী। আল্লা এক কি বহু সে সম্বন্ধে কোন মুসলমান আলোচনা করিতে সম্মত হইবেন না, মহাপুরুষ মুহম্মদ যে সর্বশেষ নবী (prophet) সে বিষয়ে কোন মুসলমানের সন্দেহ করিবার উপায় নাই। মৃত্যুর পর বিচার ও স্বর্গ অথবা নরক, এই তাহার নিঃসন্দেহ বিচার। ইহার যে কোন একটি সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিলে সে ধর্মচ্যুত বা কাফির হইয়া যায়।

ফল এই দাঁড়ায় যে, ধর্মসিদ্ধান্ত লইয়া পণ্ডিত যখন জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে মৌলানার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহেন, তখন তিনি কবুল জবাব দেন। (মৌলানার ঔদার্য অন্য স্থলে—তাহার আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে হইবে।)

ইহাই একমাত্র কারণ, কেন মুসলমান আগমনের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমান ধর্ম-দর্শনের প্রভাব, চিহ্ন-নিশানা কিঞ্চিৎ মাত্র নাই। প্রক্ষিপ্ত অল্লোপ-নিষদ শুধু সাধারণ নিয়মের দিকে রূঢ় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের পরিতাপ বাড়াইয়া দেয়। অন্যদিকে মুসলমানদের ধর্মদর্শন আলোচনা এই ষড়দর্শনের দেশে এই—মধুর ধর্মের দেশে নির্বিকার চিত্তে আপনার ঐতিহ্যানুসরণ করিল, অবহেলা করিয়া কি বিত্ত হারাইল বুঝিল না।

দুনিয়ার এই দুই বিরাট ধর্ম সাতশত বৎসর পাশাপাশি কালযাপন করিল অথচ একে অন্যকে সমৃদ্ধ করিল না—এ যেন জলের মধ্যে মীন তৃষ্ণায় কাতর রহিল!

কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য আছে। খ্রীষ্টধর্ম তাহার নাম দিয়াই খ্রীষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ইসলাম তাহার অত্যন্ত সরল অর্থের দিকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সে অর্থ সকলেই জানেন। তাঁহাকে স্বীকার করিয়া স্পেন হইতে জাভা পর্যন্ত বহু মানব যুগে যুগে আত্মার শান্তি পাইয়াছে—ইসলাম অর্থাৎ শান্তির ধর্ম।

হিন্দুরাও সর্ব তর্ক, সর্ব আলোচনা, সর্ব পূজা, সর্ব উপাসনার পর বলেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নতমস্তকে বলেন, পৃথিবীতে শান্তি হউক, অন্তরীক্ষে শান্তি হউক ; মুসলমানেরা বলেন ইহলোকে (দুনিয়া) শান্তি হউক, পরলোকে (আখিরা) শান্তি হউক।

তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল এই হিংস্র নিন্দা ভারতবর্ষে প্রচার করে একদল দুষ্ট স্বার্থান্বেষীরা। সে আলোচনা অবান্তর বলিয়াই বারান্তরে।

হিন্দু-মুসলমানে সম্পূর্ণ, অখণ্ড মিলন হইয়াছিল অন্যান্য বহু প্রচেষ্টায় ; সেগুলি

ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষা হীন তো নহে। বরঞ্চ কেহ কেহ বলেন, মানব সমাজে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিশেষতঃ অদ্যকার যুগে। ভাষা নির্মাণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থপতি, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র রাজনীতি অর্থনীতি বসনভূষণ, উদ্যাননির্মাণ, আমোদ-আহ্লাদ, কত বলিব। এই সব প্রচেষ্টার পুণ্য, পূর্ণ ইতিহাস কেন, আংশিক ইতিবৃত্তও হয় নাহ। যেদিন হইবে সেদিন সেই সুদর্শন পূর্ণাঙ্গ দেব-শিশুকে হিন্দু-মুসলমান কর্তন করিতে চাহিবে এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই হয় না।

আসল কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। সেটি এই : হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সংজ্ঞাবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডিবদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সে বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত। মুসলমানের দ্বিধাহীন একমত বলিয়া তিনি অসম্মত। ফলে উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সংমিশ্রণ হয় নাই।

তবুও হয়ত কিঞ্চিৎ হইত যদি সামাজিক ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হইতে পারিতেন। সামাজিক ব্যাপারে মুসলমান উদার। হিন্দুর সঙ্গে এক গৃহে বসবাস করিতে মুসলমানের কোন আপত্তি নাই, একই পাকের ভাত, ডাল, মাছ, কাসুন্দা সকাল সন্ধ্যা পরমানন্দে খায়—প্রশ্ন করে না কে রন্ধন করিয়াছে—একই সরোবরে স্নান করে, একই যানে ভ্রমণ করে এবং রুগ্ন হইলে বৈদ্যরাজকে ডাকা সম্পর্কে তাহার সম্পূর্ণ স্বরাজ। মৃত্যুর পর তাহাকে শ্মশানে গোর দিলেও তাহার ধর্মচ্যুতি হয় না।

অর্থাৎ মুসলমান বলে, 'শাস্ত্রচর্চা করিতে অসম্মত বটি, কিন্তু আইস একসঙ্গে বসবাস করি। হিন্দু বলে, 'বসবাস করিতে পারিব না, কিন্তু শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রস্তুত।' এক কথায় হিন্দু যেখানে উদার মুসলমান সেখানে সঙ্কীর্ণ ও মুসলমান যেখানে উদার হিন্দু সেখানে সঙ্কীর্ণ। অর্থাৎ উভয়ের জন্য বারোয়ারী চাঁদোয়া অথবা সর্বজনীন চন্দ্রাতপ নাই।

(দোষাদুষির কথা হইতেছে না। আমরা ইতিহাসের যে শিখরে দাঁড়াইয়া দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এমনি বিজড়িত যে, একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করিলে উভয়েরই পতন ও অস্থিভঙ্গের সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।)

উপরোল্লিখিত রোগনির্ণয় সাধারণ মোটামুটি ভাবে করা হইল। কিন্তু ইহার ব্যত্যয়ও আছে ও সেই সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য যে, উপরোল্লিখিত রোগ মৌলানা ও শাস্ত্রীমণ্ডলীর। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ শাস্ত্র লইয়া অত্যধিক শিরঃপীড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয় না ; পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া একে অন্যের

সঙ্গে মিলিতে ও এমন কি বসবাস করিতেও বাধ্য হয়—কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখনও উত্থাপিত করিবার সময় হয় নাই। দ্বিতীয় এই যে, শাস্ত্রালোচনা করিবার ঔদার্য শাস্ত্রীর আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষে ট্রেড সিক্রেট জাতীয় একটি নিন্দনীয় ঐতিহ্য অর্ধ-পণ্ডিতদের ভিতরে আছে। যোগ ও তন্ত্র শিক্ষা করিতে যাঁহারাই চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমান যিনিই হউন—তাঁহারাই জানেন যে, গুণীরা জ্ঞানদানে কি পরিমাণ পরাঙ্মুখ। ফলিত-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, প্রতিমা-নির্মাণ, সঙ্গীত জাতীয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও প্রয়োজনীয় বিদ্যার কথা বাদই দিলাম। অবশ্য একটি কারণও আছে, তাহাকে শাস্ত্রাধিকার বলে। অপক্ক পাত্রে যোগের ন্যায় অত্যুষ্ণ ঘৃত রাখিলে যে সে সহ্য করিতে পারিবে না তাহাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রই অকপটচিত্তে স্বীকার করিবেন যে এই শাস্ত্রাধিকার লইয়া অর্ধদগ্ধ পণ্ডিতেরা—সত্যকার বিদগ্ধেরা নহেন—অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন ও যোগ্য ব্যক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

গজনীর বিখ্যাত মহমুদের সভাপণ্ডিত গুণিজন দ্বারা মহমুদ অপেক্ষা অধিক সমাদৃত অল-বীরুণী তাঁহার ভারতবর্ষ পুস্তকে এই লইয়া পুনঃ পুনঃ পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য ও জ্ঞানতৃষ্ণার প্রশংসা করিতে হয় ও যে-সব পণ্ডিতের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ হইয়াছিল, তাঁহাদের কয়েকজনকে তসলীম করিতে হয় যে, তাঁহারা অকৃপণ ভাবে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। না হইলে অল-বীরুণী ষড়দর্শন, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিতেন কি প্রকারে? (এই প্রসঙ্গ হয়ত পুনর্বার উত্থাপিত হইবে না, তাই একটি জিনিসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; অল-বীরুণী তাঁহার পুস্তকে মহাভারতের যে পর্ববিভাগ ও তাহাদের শিরোনামা দিয়াছেন, সেগুলির সঙ্গে অদ্যকার প্রচলিত মহাভারতের বিস্তর অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এ বিষয় লইয়া কোন গবেষণা এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়া গুণিজনের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। Sachau-এর India নামক ইংরাজি অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

দুই ধর্মের চরম নিষ্পত্তি সম্মিলিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে উচ্চাঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে মিলিত করিবার আর একটি প্রক্ষিপ্ত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সে উদাহরণটি এমনি ছন্নছাড়া, যূথভ্রষ্ট যে, বিশ্বাস হয় না এমন সাধনা সে-যুগে কি করিয়া সম্ভব হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় রাজকুমার দারাশীকুহ'র কথা স্মরণ করিতেছি। কী অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ উপলব্ধির সম্মেলনে তাঁহার 'মুজম'-ই বহরেন' বা দ্বিসিন্ধু-

মিলন সৃষ্ট হইল। ১৮২০-৩০-এর সময় রাজা রামমোহন উপনিষদকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া ভারতে প্রখ্যাত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান—কার্যটি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সর্বাধিক বিলাসব্যসান মুগল রাজপরিবারের ফারসী-ভাষাভাষী সুকুমার রাজকুমার যৌবনের প্রারম্ভে কি করিয়া সংস্কৃতের বিরাট ভাণ্ডার হইতে এই অক্ষয়, অনাদৃত খনিটি কোন যোগবলে আবিষ্কার করিলেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাখিয়া তাহার অনুবাদ ফারসীতে করাইলেন—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি মূল পাণ্ডুলিপিতে নাকি দারার স্বহস্তে কৃত শুদ্ধি সম্মার্জন মার্জিনে আছে। সেই ফরাসী তর্জমা জেসুইয়ট দ্য পেরোঁ লাতিনে অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ জানি না কি করিয়া জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাণ্টের দেশের লোক, প্লেটোর ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত, হেগেলের সমসাময়িক এই দর্শনার্ণবের জর্মন কর্ণধার বলিলেন, উপনিষদ আমার জীবনে শান্তি আনয়ন করিয়াছে। তারপর জর্মনী ও পরে ইউরোপে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উপনিষদের খেই ধরিয়া নানা পণ্ডিত নানা সংস্কৃত জর্মনে তর্জমা করিলেন—সর্বত্র ভারতীয় বিদ্যা ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সে কথা আজ থাক অনুসন্ধিৎসু এই লোমহর্ষক, লুপ্তগৌরব প্রত্যর্পণকারিণী কাহিনী জর্মন পণ্ডিত বিণ্টারনিৎস (Winternitz) ও শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের 'ঈস্টার্ণ আইডিয়ালিজম্ ও বেস্টার্ণ থট' পুস্তকে পাইবেন।

দারাশীকুহ'র দ্বিসিন্ধুমিলনে তিনি ইসলামের সাধনামণি সুফীতত্ত্ব ও হিন্দু দর্শনের চিন্তামণি বেদান্ত তাঁহার জ্ঞানকাঞ্চনাঙ্গুরীয়তে একাসনে বসিয়া যে রশ্মি-ধারার সম্মেলন করিলেন, হায়, তাহা দেশের তমসান্ধকারকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।

কিয়ৎকাল পরেই 'প্রলয় প্রদোষে মোগলের উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিত' হইতে লাগিল, শবলুব্ধ গৃধ্রীদের বীভৎস চিৎকারের মধ্যে সেই যোগাঙ্গুরীয় কোন্ অন্ধকারে বিস্মৃত বিলুপ্ত হইল।

পুনর্বার ক্ষীণচেষ্টা দেখা গেল—সুভাষচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে সে প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তখন বিদেশী আসিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম।

তারপর? তারপর লজ্জা ঘৃণা পাপ
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ

হিন্দু-মুসলমান ক্ষত্রিয়েরা যখন ১৮৫৭ সালে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া সফল হইলেন না তখন তাহাই উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলাম।

যুগ্ম ক্ষাত্রতেজে তার পাপ প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদমন্ত্র ছিদ্রান্বেষী পরস্পরাঘাত
হইল বিজয়টিকা সে অভিসম্পাত॥

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
না
ভাই ভাই এক ঠাঁই ?

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা সবপ্রথম করেন অল-বীরুণী ও পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সাধনার যে চরম উৎকর্ষ বেদান্ত ও সুফী মতবাদে বিদ্যমান, তাহাদের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করেন রাজকুমার দারাশীকুহ। আমরা বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছি সেখানে প্রশ্ন ওঠে, আর কি 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' বলা চলে, না এখন বরঞ্চ বলিব 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' ?

এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিবেদন করি।

খৃষ্টানরা যে রকম এদেশে সিরিয়ন ক্যাথলিকবাদ, রোমান ক্যাথলিকবাদ এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নানা চার্চ বা মতবাদ স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসানুয়ায়ী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, মুসলমানরাও সেইরূপ সুন্নি, শীয়া ও অন্যান্য নানা রকম মজহব (Seeds) প্রচলন করার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্ব সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মুসলিম অবৈতনিক মিশনারীরা এদেশে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করিবার প্রয়াস করেন ও বেশীর ভাগ সমুদ্রযোগে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, অর্থাৎ সিন্ধু দেশ হইতে কেপ কমরিণ পর্যন্ত কর্মস্থল বিস্তৃত করেন।

যাঁহারা ফিটজিরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের ইংরাজী অনুবাদের উপক্রমণিকাটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে যে, ওমর খৈয়ামের বন্ধু হিসাবে আরেকটি লোকের নাম তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে—সে নাম হাসন বিন্ সব্বার। এই হাসন সব্বা স্বধর্ম ও স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে পারস্যে এক ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতকদের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন ; সেই ঘাতকদের নাম হশীশিয়ুন এবং হশীশিয়ুনরা ক্রুসেডের নাইটদের মধ্যে এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, সেই হশীশিয়ুন শব্দ ল্যাটিনের ভিতর দিয়া ইতালীর assassino হইয়া, ফরাসী assassin-এ রূপান্তরিত হইয়া ইংরিজিতে সেই বানানেই প্রচলিত

আছে। হানন সব্বা পারস্তে আপন কর্মভূমি সীমাবদ্ধ করেন নাই। বিদেশে স্বমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় গুজরাটে তিনি মিশনরী প্রেরণ করেন। তাঁহাদেরই একজন লোহানা রাজপুতদিগের মধ্যে অ্যাসাসিনদের শীয়া ধর্ম প্রচার করেন। ইঁহারা বর্তমানে পশ্চিম ভারতে 'খোজা' সম্প্রদায় নামে সুপরিচিত। কলিকাতার রাধাবাজারে ইহাদের কাহারো কাহারো কাপড়ের দোকান আছে।

এস্থলে শীয়া-সুন্নি মতবাদ লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ততোধিক নিষ্প্রয়োজন শীয়াদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের পার্থক্য লইয়া বাক্যব্যয় করা। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, হাসন সব্বার মতবাদী খোজা মুসলমানরা উত্তর ভারতের শীয়া হইতে ভিন্ন; উত্তর ভারতের শীয়ারা ইসনা আশারী অর্থাৎ বারোজন গুরুতে বিশ্বাস করেন, 'খোজারা' ইসমাঈলি অর্থাৎ ইসমাঈলকে শেষ প্রধান গুরু হিসাবে বিশ্বাস করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সব বিভিন্ন মতবাদের আংশিক ইতিহাস এনসাইক্লোপীডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস এবং পূর্ব ইতিহাস এনসাইক্লোপীডিয়া অব ইসলামে পাইবেন।

লোহানা রাজপুতরা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করিতেন ও সম্ভবতঃ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (Schrader-এর আজিয়ার হইতে প্রকাশিত পাঞ্চরাত্র সিস্টেম দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বৈষ্ণব যে ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ তাঁহারা বিষ্ণুর দশ অবতারে বিশ্বাস করিতেন।

অদ্যকার খোজাদের মধ্যে কুরাণ শরীফের প্রচলন নাই। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি আংশিক কচ্ছের উপভাষায় ও আংশিক গুজরাতিতে লেখা। সেগুলি 'গিনান' (সংস্কৃত 'জ্ঞান') নামে প্রচলিত ও তাহাদের মধ্যে 'দশাবতার' পুস্তক বা 'গিনান' সর্বাধিক সম্মান পায়। লোহানা রাজপুতদিগকে যে মিশনরী ইসমাঈলি শীয়া মতবাদে দীক্ষিত করেন সেই নূর-সৎ-গুর ('নূর' আরবী শব্দ 'রশ্মি' অর্থে ও 'সৎগুর' 'সৎগুরু' হইতে) দশাবতারের প্রণেতা। খোজারা সাধারণ মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁহাদের স্বতন্ত্র 'জমাতখানা' বা 'সম্মেলন গৃহে' জমায়েত হন। বিশেষ পর্ব উপলক্ষে 'দশাবতার' পঠন হয়, প্রথম নয় অবতার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন; কিন্তু দশমাবতারের কাহিনী আরম্ভ হইলে তাঁহারা দণ্ডায়মান হন।

এই দশমাবতার লইয়া বৈষ্ণবে ও খোজায় পার্থক্য। বৈষ্ণবমতে দশমাবতার কল্কি, খোজামতে দশমাবতার বহুকাল হইল মক্কায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি মহাপুরুষ মুহম্মদের জামাতা হজরত আলী। (পাঠককে এইস্থলে স্মরণ করাইয়া

দেই যে, গোঁড়া শীয়ারা আলীকে মহাপুরুষ মুহম্মদ অপেক্ষা সম্মান প্রদর্শন করে ও আদালুসের ইবনে হাজমের মতে এমন শীয়াও আছেন যাঁহারা বলেন, "দেবদূত = ফিরিস্তা জিবরঈল = Gabriel 'ভ্রমবশতঃ' কুরাণ শরীফ হজরত আলীকে না দিয়া হজরত মুহম্মদকে দিয়া ফেলেন"!!! এবং আরও বিশ্বাস করেন যে, হজরত আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসন তৎপর তাঁহার ভ্রাতা হুসেন, তৎপর জয়ন উল-আবেদীন তৎপর তাঁহার পুত্র হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে চলিতে বর্তমান জীবিত ইমাম বা গুরুতে বিরাজমান—বর্তমান গুরুর নাম পরে উল্লেখ করিব।

খোজারা অর্ধ-কচ্ছী-উপভাষা ও অর্ধ-গুজরাতিতে উপাসনা করেন—তাহাকে 'নামাজ' বলিলে ভুল বোঝানো হইবে। রমজান মাসে খোজারা উপবাস করেন না। হজ করিতে মক্কায় যান না—বর্তমান ইমাম বা গুরুদর্শনে হজের পুণ্যসঞ্চয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। গরীব দুঃখীকে 'জকাত' বা ধর্মাদেশানুযায়ী 'ভিক্ষা' দেন না, সে অর্থ গুরু দ্বারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে দেন। খোজারা পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবার উপাসনা করেন এবং সুন্নি ও শীয়া মত হইতে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসে অন্যান্য বহু অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

খোজাদের 'গিনান' বা ধর্মগ্রন্থগুলি পড়িলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ্যাসাসিন মিশনারিরা হিন্দু এবং শীয়া মতবাদের সম্মেলনে এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তাবৎ ভারতীয়দিগকে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ উল্লেখ করিলাম কারণ ইহা শীয়াদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। ইহার পর ভাষা নির্মাণে কাব্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন রসবস্তু সম্মেলনে যে সব প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ সুন্নিদের দ্বারা।

গুজরাতে 'মতিয়া' সম্প্রদায়ও বিবাহের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু মৃত্যুর পর শব কবরস্থ করিবার জন্য মোল্লার কাছে আরজী পেশ করেন। পশ্চিম উপকূলে এইরূপ নানা সংমিশ্রণের চিহ্ন সর্বত্র পাওয়া যায়।

এইসব চেষ্টার ফলেই ১৭৫০ সালে লিখিত গুজরাতের ফারসী ইতিহাস মিরাত-ই অহমদীতে দেখা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক কলহ তখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লেখক আলী মুহম্মদ খান তাঁহার হাজার পাতার (মুদ্রিত) পুস্তকে যে দুই একটি কলহের উদাহরণ দিয়াছেন সেগুলি তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় রূপেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খোজাদের বর্তমান গুরু হিজ হাইনেস দি আগা খান।

ভাই ভাই এক ঠাঁই

১

বারান্তরে হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রীয় মিলনের ফলে উপজাত 'খোজা' মতবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে যেস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার সম্মুখে মিলনের সুধা-শ্যামলিমদিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত—তাহার পুণ্য পরিক্রমা আরম্ভ করিব, এমন সময় একটি অতি আধুনিক ঘটনার দিকে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। কালানুপূর্বের ধারাবাহিকতার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা প্রদর্শন না করিয়া অসময়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা করিব, কারণ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিবিন্দু হইতে অসাময়িক হইলেও অবান্তর নহে।

গত মঙ্গল-শুক্রবারে* যখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ ও বহু বাঙালী-অবাঙালী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া আন্তরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তখন অনেকেই হয়ত আশা করিবার সাহস রাখেন নাই যে, মুসলমানেরা, বিশেষতঃ মুসলমান ছাত্রসমাজ ইহাতে যোগদান করিবেন। আমরা নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পাঠকের গোচর করিতেছি।

A large number of Muslim students participated in the recent disorders in Calcutta. One of them lost his life, and many received injuries, serious and light. The student of the Islamia College went on strike in sympathy with their Hindu fellow students and in protest against the firing and lathi charge by the police. The vice-president of the College Union presided over a huge meeting which passed appropriate resolutions. Large numbers of Mulims, other than students, also took part in the demonstrations. Many non-Muslims wonder why these Muslims have taken this attitude. The answer is not difficutt to find. It is the Muslim way, the result of over 13 centuries of teaching expressed in the practice of the precepts laid down in the holy Qur'an and the traditions of the prophet Muhammad: Love your neighbours, side with him that is weak, oppressed

* ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

or ill-used, serve Allah by serving his creatures ; the true Muslim is represented in his two little things, his heart and his tongue.

এতদিন ধরিয়া আমরা ঠিক এই কথাটিই বলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সর্ব ধর্মের মূলতত্ত্ব সমান, আমরা সকলে একথা স্বীকার করি ; কিন্তু আচার-ব্যবহারে অশন-বসনে সেই তত্ত্বগুলি যখন প্রকাশ পায়, তখন অনেক সময় এমন বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে যে, তখন মানুষ শুধু সেই মানুষগুলির আচরণের নহে তাঁহাদের ধর্মের উপরও দোষারোগ করিতে থাকে। সবিস্তর নিবেদন করি :—

ইংরেজরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম আনয়ন করেন। খ্রীষ্টধর্ম মৈত্রী ও ক্ষমার ধর্ম। কিন্তু দেড়শত বৎসর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরও এদেশে দেখি, দিশি খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, শ্বেত খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, আহার-বিহার সামাজিক গণ্ডি স্বতন্ত্র, এমন কি মৃত্যুর পাণ্ডুহস্ত স্পর্শেও কৃষ্ণ-খ্রীষ্ট ধবল হয় না ;—তাহার জন্য স্বতন্ত্র গোরস্তান। ইংরেজ শাসকের স্বৈরতন্ত্র মুসলমান শাসকের 'এখতেয়ারী' অপেক্ষা সর্বাংশে অধিক চর্মদাহে মর্মদাহে তাহা বার বার অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম, এদেশে সসম্মানে বরিত ও নন্দিত হইল না। ধর্মপিপাসু মন বার বার শুধায়, ত্রুটি কোন্-খানে ? হয়ত যাঁহারা বাহকরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্মের সত্য সেবক ছিলেন না।

তাই বলি এদেশের মুসলমান ধার্মিক। ব্যাপক অর্থে ধার্মিক। তিনি আরব-তুর্ক-মোগল বিজেতাদের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মাগার, ভোজনাগার, অনন্ত-শয্যাগার নির্মাণ করেন নাই। তিনি স্বধর্ম পালন করিয়া হিন্দুর প্রতিবাসী হইয়াছেন। বিদেশী-শকট-যুগ্ম যখন হিন্দু-মুসলিমের যুগ্ম-স্কন্ধকে চরম মর্দনে প্রপীড়িত করিল, তখন বর্ণ-ধর্ম ভুলিয়া দুই নিরীহ বলীবর্দ যুগ্ম-পদাঘাতে শকটারোহীকে সচেতন করিয়া দিল।

উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক ইসলামের মূলনীতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন, সজোর লেখনী সঞ্চালনে প্রকাশ করিয়াছেন।

"We do not blame the action of the students, for that matter, the action of the other Muslims who took part in the demonstrations ; but it is the students in particular whom we are addressing. We commend their action and

admire it. Furthermore, we thoroughly understand the noble motives which have actuated them."

এ সত্য মুসলমানের কথা! এ সত্য মানুষের কথা! ধর্মের কথা ন্যায়ের কথা! এই ভাই কোন ভিন্ন ঠাঁই যাইবে?

কিন্তু,

The Muslim students know fully well that their life and future are in jeopardy in a country where though a hundred million, the Muslim are in a minority. They realise the designs against them as Muslims.

মুসলমানদের ভীত হইবার কারণ আছে কিনা সে প্রশ্ন আমরা কেন জিজ্ঞাসা করিব? কারণ লেখক নিজেই ভীত হন নাই—ভীত হইয়া স্বধর্মীয়দিগকে গণ অভিযান হইতে পশ্চাৎপদ হইতে বলেন নাই; নিজেই বলিতেছেন:

Still they have not hesitated to plunge into the fury, why? It is the Muslim way. Their hearts told them the I. N. A. trial was unjust. The lathi charges were brutal, the firing absolutely unjustified. It was their bounden duty to sympathise. Their hearts, brimful with the sublime teachings of Islam made them translate their sympathy into action. Some of them fell, side by side, with those who, perhaps not in person, represented the terrible menace to Islam and Muslim in India.

It was the Muslim way, most nobly expressed.

আমেন। তথাস্তু!

আমাদের তো বলিবার আর কিছুই নাই। সাহস পাইলাম, ভরসা পাইলাম, যে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের শঙ্খধ্বনি ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিবে, সেদিন তাহার রুদ্রদমন-চেষ্টা পুনর্বার ক্রূর বুধ-শুক্র রূপ ধারণ করিবে, সেই শুভদিনে প্রতিবাসী যখন প্রতিবাসীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে সেদিন তরুণ মুসলিম, প্রবীণ মুসলিম 'মুসলিম-ওয়ে' মুসলিম-পন্থায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে—তাহার বিরুদ্ধে কি 'design', কি 'menace' ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিবে না।

এতদিন যাবৎ হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির যে সব স্থলে যোগ হয় নাই তাহারই উল্লেখ করিতেছিলাম। দেখিলাম সাতশত বৎসর ধরিয়া ভট্টাচার্য টোলে সংস্কৃত ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন, কিন্তু ইসলামের নিকট হইতে কোনো ঋণ গ্রহণ করিলেন না; মৌলানা আরবী-ফারসী জ্ঞানচর্চা করিলেন, কিন্তু ভট্টাচার্যের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, হিন্দু দর্শন, মুসলমান দর্শন একে অন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া জীবিত রহিল।

কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা? ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান চাষা মজুর শতকরা কয়জন ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জীবনযাপন করিয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আদর্শ একে অন্যের সাহায্য লইয়া তাহারা কি পণ্ডিত মৌলবীকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ করে নাই? ভট্টাচার্য তাঁহার দেবোত্তর জমি ও মৌলানা ওয়াকফদত্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেন, উভয়ের উপর এমন কোনো অর্থনৈতিক চাপ ছিল না যে বাধ্য হইয়া একে অন্যের দ্বারস্থ হন। কিন্তু মুসলমান চাষা তো এ দম্ভ করিতে পারে নাই যে হিন্দু জেলেকে সে ধান বেচিবে না, হিন্দু জোলা তো এ অহংকার করিতে পারে নাই যে মুসলমানকে কাপড় না বেচিয়াও তাহার দিন গুজরান হইবে।

শাস্ত্রী ও মৌলানা যে সব কারণবশতঃ সর্বজনীন চন্দ্রাতপতলে একত্র হইতে পারিলেন না, সে সব কারণ তো চাষামজুরের জীবনে প্রযোজ্য নহে। ব্রহ্ম এক কি বহু, সগুণ কি নির্গুণ—তাহা লইয়া সে হয়ত অবসর সময়ে কিছু কিছু চিন্তা করে, কিন্তু এসব তো তাহার কাছে জীবনমরণ সমস্যা নহে—এমন নহে যে, ঐ সম্পর্কে কলহ করিয়া একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবে না। তাহার উপর অর্থনৈতিক চাপ নির্মম চাপ, যাহাকে বলে অন্নচিন্তা চমৎকারা। তাই দেখিতে পাই মোল্লা-মৌলবীর বারণ সত্ত্বেও মুসলমান চাষা জানিয়াশুনিয়া হিন্দুকে বলির জন্য পাঁঠা বিক্রয় করে, পয়সা রোজগারের জন্য বিসর্জনে ঢোল বাজায়; হিন্দু গয়লা মুসলমান কসাইকে এঁড়ে বাছুর বিক্রয় করে। এই কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান শব্দার্থে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ লইয়াছে। আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাইয়াছে। সে-সব কি তাহারা ধর্মে, লোকসাহিত্যে, গানে, ছবিতে প্রকাশ করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে তাহা পুস্তকাবদ্ধ নস্যসিক্ত শাস্ত্রালোচনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম ও দর্শনালোচনা অপেক্ষা অনেক সত্য, অনেক জীবন্ত। লক্ষ কণ্ঠে গীত কবীরের ধর্মসংগীত, ষড়দর্শন ও ইলমুলকালাম

হইতে লক্ষগুণে নমস্য।

হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের যুগ্ম চেষ্টায় ভারতবর্ষে গত সাতশত-আটশত বৎসর ধরিয়া যে-কৃষ্টি যে-সভ্যতা নির্মিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব। কি ধর্মে, কি ভাষা-নির্মাণে, কি সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কি সংগীতে, কি নৃত্যে, কি বিলাস-সামগ্রী নির্মাণে, তৈজসপত্রে—কত বলিব? ইহারা যে প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে, দানে-গ্রহণে যে অকৃপণতা দেখাইয়াছে তাহা—আবার বিশেষ জোর দিয়া বলি—সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব, সমগ্র জগতের কল্পনার অতীত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোন দুই ধর্ম কস্মিন্‌কালেও করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা তোলা অনুচিত, কিন্তু যে-বিষয়ে অধম গত পঁচিশ বৎসর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে তাহার সম্যক্ মূল্য বুঝিবার জন্য সে দেশে-বিদেশে সর্বত্র—সর্বপ্রকার লোকসংগীত ও অন্যান্য জনপদকলা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, আকর্ণ-বিস্ফারিত চক্ষে দেখিয়াছে। সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন, কিন্তু অধর্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জনিত দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকসংগীতের কাছে ইউরোপের তথা অন্যান্য প্রাচ্যদেশের (চীনের কথা বলিতে পারি না) কোনো লোক-সংগীত দাঁড়াইতে পারে না, না, না।

অতএব আমাদের কর্তব্য এই আটশত বৎসরের সর্বপ্রকারের জনপদ-প্রচেষ্টা খুঁটিয়া খুঁটিয়া চিরিয়া চিরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা, লিপিবদ্ধ করা, কলের গানে রেকর্ড করা, ইতিহাস লেখা ও সর্বশেষে তাহাকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইস্কুল-কলেজে পড়ানো।

আবার বলিতেছি ইস্কুল-কলেজে পড়ানো। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থপতি যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে ইহাই হইবে তাহার সুদৃঢ়, অচল-অটল ভিত্তি। শিখর, মিনার কে নির্মাণ করিবেন, কোন্ দর্শন, কোন্ শাস্ত্রীয় ধর্ম দিয়া—সে আলোচনা পরে হইবে।

কিন্তু যে কর্মটির প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম তাহা তো একজন, শতজন, হাজারজনের অক্লান্ত পরিশ্রমেরও বাহিরে। এত লোকসংগীত, স্থপতি, চিত্র, সংগীত, নৃত্য ভারতের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সর্বত্র হকজ্যোতি হইয়া মৃতপ্রায়, তাহাকে সংগ্রহ করিবার জন্য নেতৃত্ব করিবেন কে?

আমাদের পরম সৌভাগ্য, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বের সর্বত্র রাজাধিরাজের সম্মান পাইয়াও এই কবি লালন ফকীরকে উপেক্ষা করেন নাই, হাসন রাজার গান গাহিয়া বিদগ্ধ দার্শনিকমণ্ডলীর সম্মুখে

অবতরণ করিলেন।

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।

(কাশীতে প্রদত্ত দার্শনিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের দৃষ্টি এদিকে পূর্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় উৎসাহে তিনি এই কর্মে আরও মনোযোগ করিলেন, বহু অমূল্য লুপ্তধন সঞ্চয় করিলেন। দেশের লোক তাহা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

ভারতবর্ষের লোকসংগীত লইয়া চর্চা করিতে হইলে উত্তর-ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা-উপভাষার পণ্ডিত হইতে হয় ও এই সব সংগীতের পশ্চাতে যে সংস্কৃত ও ফারসীতে লিখিত ও গীত ভক্তি-সুফী-বেদান্ত-যোগবাদ রহিয়াছে তাহার সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন।

অধমের নাই। বাহির হইতে যেটুকু সামান্য দেখিয়াছি তাহাই নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠককে সাবধান করিয়া দিতেছি, আলোচনা অতি অসম্পূর্ণ ও দোষত্রুটিতে কণ্টকিত থাকিবে। এবং ইতিমধ্যে অন্য কেহ যদি আলোচনাটি আরম্ভ করেন তবে অধম তাঁহাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়া পরমানন্দে শ্রোতার আসনে গিয়া বসিবে।

৩

পূর্বের প্রবন্ধে সামান্য আভাস দিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষীয় লোকসংগীতের মূল্য ও তাৎপর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদান্ত, যোগ, ভক্তিবাদ ও সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

সুফীবাদ (ভক্তি, যোগ ও mysticism-এর সমন্বয়) ভারতবর্ষে আসে পারস্য হইতে ও এদেশের দর্শন ও ভক্তিরস ইহাকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আরেকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য আকর্ষণ করিব।

১৯১৮-র যুদ্ধে যখন ফ্রান্স ও জর্মনী ক্লান্ত, তখন পণ্ডিত-মহলে দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধ সুফীবাদ লইয়া। একদিকে ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত মাসিন্নো, অন্যদিকে জর্মনীর তদপেক্ষা বিখ্যাত পণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসীহার ও তস্য শিষ্য

হর্তেন। মাসিন্নো পক্ষ বলিলেন, ইরানের সুফীবাদের উপর ভারতবর্ষীয় কোন প্রভাব পড়ে নাই, যেটুকু পড়িয়াছে তাহা সুফীবাদ ভারতবর্ষে আসিবার পর। অন্যপক্ষ নানা প্রকার যুক্তিতর্ক দলিলদস্তাবেজ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই অর্থাৎ ইরানের বর্ধিষ্ণু সুফীবাদ বেদান্ত ও যোগরস পুনঃ পুনঃ পান করিয়াছে।

তর্কটি পাত্রাধার তৈলজাতীয় আপেক্ষিক, নিরর্থক নহে। সুফীবাদ অনুসন্ধান করিলে যদি সপ্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষীয় দর্শনের লাঞ্ছন তাহার উপর রহিয়াছে তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গম্ভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়, সেটি এই যে, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন এককালে ইরান পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

এ সন্দেহ বহু পূর্বেই কোন কোন পণ্ডিত করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন যে ইরান নহে, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে সন্দেহ প্রথম জাগে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে, যখন তাঁহারা বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন মাঙ্গলিকের (Old and New Testaments) তুলনাত্মক আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহুদিদের প্রাচীন মাঙ্গলিকের যে হিংস্র নীতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে পীড়া দেয়, সেইরূপ খ্রীষ্টের ক্ষমা ও দয়ার নীতি নবীন মাঙ্গলিকে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আনন্দ ও সাহস দেয় (একদিকে An eye for an eye, and a tooth for a tooth ও অন্যদিকে Love thy neighbour, offer the left cheek ইত্যাদি তুলনা করুন)। পণ্ডিতমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কি করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ঐ হিংস্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন ও প্রচার করিবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিলেন ? তবে কী কোনো বৌদ্ধশ্রমণের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল ? বিশেষতঃ তাঁহার যৌবন কোথায় কি প্রকারে যাপিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বাইবেল যখন নীরব।

এ প্রশ্নের সমাধান অদ্যাপি হয় নাই, কখনো হইবে এ আশাও আমার নাই। কিন্তু সে সমস্যা উপস্থিত তুলিবার প্রয়োজন আমার নাই—সে বড় জটিল ও এস্থলে অবান্তর।

তবে একথা আমরা জানি যে, বৌদ্ধশ্রমণেরা ইরান, আরব পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন ও সেই তত্ত্ব জানি বলিয়া যখন সুফীবাদে মাঝে মাঝে এমন চিন্তাধারার সন্ধান পাই, যাহা অবিমিশ্র সনাতন ইসলামে নাই, অথচ শূন্যবাদের অত্যন্ত পাশ দিয়া বহিতেছে, তখন মন স্বতঃই প্রশ্ন করে, তবে কি উভয়ের কোথাও যোগ আছে ?

মাসিন্নো ও হর্তেনে এই তর্ক চলিয়াছিল বহু বৎসর ধরিয়া। পৃথিবীর বিদগ্ধ-জন সে তর্ক অনুসরণ করিয়া যে কী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কখনো বিস্মৃত হইবেন না। হর্তেন স্বীয় মত সমর্থন করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান লিখিলেন, তাহাতে সূফীবাদের সঙ্গে বেদান্ত শব্দে শব্দে মিলাইয়া বলিলেন, এ রকম সাদৃশ্য যেস্থলে বর্তমান, সেখানে প্রভাব মানিতেই হইবে।

এ তর্কও কখনো শেষ হইবে না। কারণ এ কথা ভুলিলে চলিবে না, মানবাত্মা যখন কর্ম ও জ্ঞানযোগে তাহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারে না, তখন সে ভক্তির সন্ধান করে। মানব যখন দুঃখ-যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তখন অকস্মাৎ তাহারই গভীর অন্তস্তল হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহাকে রহস্যময় ইঙ্গিত করেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানুষ তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষে সর্বচৈতন্য সংযোগ করে। তাহাই যোগ।

বহু ক্যাথলিক সাধু যোগী ছিলেন অথচ তাঁহারা ভারতের যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র উপযুক্ত সোপান আরোহণ দৃষ্ট হয়। কর্ম জ্ঞান ও তৎপর ভক্তি। আর যোগ তো অহরহ রহিয়াছে। ঘোর সংসারীও যখন অর্থশোক ভুলিবার চেষ্টা করে, তখন সে যোগের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। শুধু দ্বিতীয় সোপানে সে যাইবার চেষ্টা করে না—হিরণ্ময় পাত্র দেখিয়াই সে সন্তুষ্ট—তাহাকে উন্মোচন করিয়া চরম সত্য দর্শন করিবার প্রয়াস তাহার নাই।

যোগ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল ও এখনও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যোগকে বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ সর্বজনগম্য করা হইয়াছে, তাহাকে যুক্তিতর্ক ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ দর্শন করা হইয়াছে, সে রকম আর কোথাও করা হয় নাই—একমাত্র ইরান ছাড়া। সূফীরা ভারতবর্ষীয় যোগীর ন্যায় অন্তর্লোকে সোপানের পর সোপান অধিরোহণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এক সূফী অন্য সূফীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

ফলে কখনো নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধে বিলীন হইয়াছেন (ফানা), কখনো ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সেই একাত্মবোধ রসস্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মন্ তু শুদম, তু মন্ শুদি,
মন তন্ শুদম, তু জাঁ শুদি।
তা কসি ন গোয়েদ বাদ আজ ইন
মন দিগরম তু দিগরী॥"

"আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে,
আমি দেহ হইলাম, তুমি প্রাণ,
ইহার পর আর যেন কেহ না বলে,
আমি ভিন্ন এবং তুমি ভিন্ন।"

ইহাই তো সত্য ধর্ম। এ মন্ত্র ব্রহ্মে বিলুপ্তির মন্ত্র এবং এ মন্ত্র বিবাহের মন্ত্র। খ্রীষ্টসাধু যীশুকে বিবাহ করে, চার্চকে বিবাহ করে, শ্রমণ সঙ্ঘকে বিবাহ করে আর আমাদের মত সাধারণ মানুষ প্রিয়াকে এই মন্ত্রে বরণ করিয়া সংসারপথে চলিবার শক্তি পায়।

৪

মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে সূফী বা ইরানী ভক্তিমার্গ প্রচার করিলে পর হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে যে সব সাধক মধুরকণ্ঠে আত্মার রহস্য-লোকের অভিজ্ঞতার গান গাহিলেন তাহার সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিচয় আছে। কবীরের নাম শোনেন নাই এমন লোক কম ও যাঁহারাই ভারতীয় কৃষ্টির সত্য, বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সিংহাবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই অন্যান্য নানা সাধকের ভজন দোহার সঙ্গে সুপরিচিত।

উত্তর ভারতে যে-সব সাধক জনগণের হৃদয়মন ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আংশিক পরিচয় মাত্র দিতে হইলেও বহু বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। সংবাদপত্রের বিক্ষিপ্ত স্তম্ভের উপর সে বিপুল সৌধনির্মাণ করা সম্ভবপর নহে। অনুসন্ধিৎসু ও রসজ্ঞ পাঠক সে সৌধের সন্ধান পাইবেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদু' পুস্তকের ভূমিকায়, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার স্টেফানস নির্মলেন্দু বক্তৃতায়।

উত্তর ভারতে এই সাধনার দ্বারা পূর্ব ভারতে সপ্রকাশ হয় আউল, বাউল, মুর্শিদিয়া, সাঁই, জারীগানের ভিতর দিয়া। সে-সব গীতের সঙ্কলন এযাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হয় নাই। দুইজন গুণী এই কর্মে লিপ্ত আছেন ও রসিক-জনের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও শ্রীহট্টের মৌলবী আশরফ হোসেন বহু পরিশ্রম করিয়া নানা সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। (এই মহান্ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া দ্বিতীয়োক্ত মহাশয় কয়েক মাস পূর্বে আসাম সরকারের নিকট হইতে যে কি উৎকট প্রতিদান পাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আরেক দিন আলোচনা করিবার বাসনা রহিল)।

লালন ফকীর, শীতালং শাহ, রাধারমণ, গোলাম হুসেন শাহ, হাসন রাজা,

ভেলা শাহ, সৈয়দ জহরুল হোসেন, সৈয়দ শাহ নূর প্রভৃতি সাধকমণ্ডলীর পরিচয় এই সব সঙ্কলনে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে ইঁহাদের অধিকার দৈনন্দিন জীবনের নিম্নতম কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে আত্মার উচ্চতম রহস্যলোকের প্রতি ইঁহাদের অভিযান যে কি পরম বিস্ময়জনক, লোমহর্ষক তাহা বর্ণনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তো আমার নাই। গ্রহচন্দ্রে, তারায় তারায় অনন্তের যে সুগম্ভীর বীণাধ্বনি প্লাবন মন্ত্রে মুখরিত, রুদ্রের ত্রিকাল ত্রিকোলস্পর্শী দক্ষিণ হস্তে যে রুদ্রাক্ষ জন্মমৃত্যু সৃষ্টিপ্রলয়ের অন্তহীন চক্রে ঘূর্ণায়মান তাহারই স্পন্দন নমস্য সাধকেরা অনাবিল চৈতন্যগোষ্পদে শতরাগে বিম্বিত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। পুনরাবৃত্তি করি, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, উপনিষদের ঋষি যে প্রকারে দর্শন করিয়াছিলেন, মু'তাজিলা সুফী পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যোগে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সে রহস্যলোকের ব্যঞ্জনা সাধকেরা দিয়াছেন মধুর কণ্ঠে, ছন্দগানে। রসিকজন শ্রবণমাত্র ভাবরসে আপ্লুত হইয়াছেন। নীরস গদ্যে অরসিকজন তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেন বিড়ম্বিত হইবে?

আমাদের পক্ষে শুধু সম্ভব সাধকগণের রসস্রোতধারার ভৌগোলিক উৎপত্তি-স্থলের অনুসন্ধান করা। কোন্ পর্বত-কন্দরে তাহার উৎপত্তি, কোন দেশে-প্রদেশের উপর দিয়া তাহার গতি, কোন মহাসমুদ্রে তাহার নিবৃত্তি সে অনুসন্ধান ভূগোল আলোচনার ন্যায়; তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, রসাস্বাদনের প্রত্যক্ষ আনন্দ তাহাতে হয় না। গঙ্গার উৎপত্তি নিলয় জানিয়া তাপিত দেহে গঙ্গাবগাহন-জনিত স্নেহসিক্ত শান্তিলাভ হয় না, পুণ্যলাভ তো সুদূরপরাহত।

রসিকজন এই অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় বিড়ম্বনাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি, আ মরি।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও মনে পড়িতেছে, পরমহংসদেবও বলিয়াছেন, মদ শুঁকিলেই নেশা হয় না, চাখিলে নেশা হয় না, এমন কি সর্বাঙ্গে মাখিলেও নেশা হয় না, নেশা করিতে হইলে মদ খাইতে হয়। অর্থাৎ সে রসসায়রে নিমজ্জিত হইতে হয়, পারে দাঁড়াইয়া সে অমৃতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম। তাই বাউল বলিয়াছেন,

যে জন ডুবল, সখি, তার কি আছে বাকি গো?

তখন তো তাহার আর দুঃখ-যন্ত্রণা নাই, সে তো জন্ম-মৃত্যুর অতীত। রাজসিক কবি শ্রীমধুসূদন পর্যন্ত বলিয়াছেন:

মক্ষিকাও গলে না গো সে অমৃত হ্রদে

সৈয়দ শাহনুর গাহিয়াছেন :

রসিক দেখে প্রেম করিয়ো যার দিলেতে ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
ওজুদে মজুদ করি লীলার কারখানা,
সৈয়দ শাহনুর কইন দেখলে তনু ফানা॥

যিনি ব্রহ্মানন্দে আত্মনিলয় (ফানা) করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র সেই রসিকের সঙ্গে প্রেম করিবে। তদভাবে তুমি চক্ষুষ্মান অন্ধ। এই দেহেই (ওজুদ) লীলার কারখানা মজুদ। তাহা যদি দেখিতে পারো তবেই তুমি দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ (ফানা) করিবে।

(শব্দতাত্ত্বিক লক্ষ করিবেন ভাষার দিক দিয়াও এই চৌপদী 'রুবাইয়াৎ'টি হিন্দু-মুসলীম আধ্যাত্মিক সাধনার কি অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত—রসিক, প্রেম, লীলা শুদ্ধ সংস্কৃত, চোখ, কানা বাঙলা; ফানা ওজুদ মজুদ শুদ্ধ আরবী; কারখানা ফারসী কইন বাঙাল।)

অরসিক, অপ্রেমিককে এইসব সাধক কখনো করজোড়ে নিবেদন করিয়াছেন যেন ভৌগোলিক শব্দতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক করিয়া রসভঙ্গ না করেন, কখনো নিরুপায় হইয়া কাতরকণ্ঠে দিব্যিদিলাসা দিয়াছেন। তাই ক্ষমাভিক্ষা করিয়া অদ্যকার সভার 'রসভঙ্গ' করি, কবিগুরু কর্তৃক নন্দিত সেই হাসন রাজার গীতি সংকলন 'হাসন-উদাসের' সর্বপ্রথম গীতিটি উদ্ধৃত করিয়া এবং তৎপূর্বে এই মাত্র নিবেদন করি যে, সাধারণতঃ বাউলরা পরমাত্মা মহাপুরুষ ও গুরুর বন্দনা সমাপ্ত করিয়া রস সৃষ্টি আরম্ভ করেন। কিন্তু হাসন রাজা অপ্রেমিক, রবাহূতের আগমন ভয়ে আল্লা-রসুল বন্দনার পূর্বেই বলিতেছেন,

"আমি করিয়ে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই, কসম দেই, আমার বই হাতে নিবে না॥
বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যে জনা এ সংসারে হবে না॥
অপ্রেমিকে গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে লাল-ধলা চিনবে না॥
হাসনরাজায় কসম দেয়, আর দেয় মানা
আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা॥

সাক্ষরকে নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিবার পন্থা

১

জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তার সমস্যা লইয়া যাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে শতকরা দশজন লিখিতে পড়িতে পারিত ও আজ নাকি দশের পরিবর্তে বারোয় দাঁড়াইয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, শিক্ষাবিস্তারের কর্মটি সদাশয় সরকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে। স্বরাজপ্রাপ্তি আমরা যেমন সদাশয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেই নাই, ঠিক সেইরূপে শিক্ষাবিস্তার সমস্যায় আমাদেরও ভাবিবার ও করিবার আছে। শিক্ষানবীশরাও বলেন যে, আমাদের মত অর্ধশিক্ষিত লোকের সাহায্য পাইলেও নাকি নিরক্ষর দেশকে সাক্ষর করার পথ সুগম হইবে।

সমস্যার জটিল গ্রন্থি এই যে যদিও প্রতি বৎসর বহু বালক পাঠশালা-পাস করিয়া বাহির হয়, অর্থাৎ সাক্ষর হইয়া সামান্য লেখা-পড়া করিতে শিখে, তবুও কয়েক বৎসর পরেই দেখা যায় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইয়া গিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পাঠশালা-পাসের পর পড়িবার মত কোনই পুস্তক তাহারা পায় না। আমার এক স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কৈবর্ত, নমঃশূদ্র ও মুসলমান জেলেদের ছেলেরা যত শীঘ্র পুনরায় নিরক্ষর হয়, অপেক্ষাকৃত ভদ্রশ্রেণীতে ততটা নয়। তাঁহার মতে কারণ বোধ হয় এই যে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বাড়ীতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রচলন কম ও মুসলমানদের জন্য বাঙলায় সরল কোন ধর্মপুস্তক নাই।

মধ্য ইউরোপের তুলনায় বল্কান শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া আমিও ঠিক এই তত্ত্বই আবিষ্কার করি। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে যোগ তাহাদের "উপাসনা পুস্তিকা"র মধ্যবর্তিতায়। পাঠকের অবগতির জন্য নিবেদন করি যে, ক্যাথলিক ক্রীশ্চানরা শাস্ত্রাধিকারে বিশ্বাস করেন। গ্রামের পাদ্রী সাহেবের অনুমতি বিনা যে কেহ বাইবেল পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য বরাদ্দ 'উপাসনা পুস্তিকা' বা "প্রেয়ার বুক", যেমন শূদ্র স্ত্রীলোককে বেদাভ্যাস করিতে আমাদের দেশেও নিষেধ ছিল। তাহাদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পদাবলী।

প্রত্যেক ক্যাথলিকের একখানা উপাসনা পুস্তিকা অতি অবশ্য থাকে। গ্রামের

বুড়ী উপন্যাস পড়ে না, খবরের কাগজ পড়ে না, এমন কি চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজনও তাহার হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সে উপাসনা পুস্তিকা হইতে কিছু না কিছু পড়ে ও রবিবারে গীর্জায় বেশ খানিকটা অধ্যয়ন করে।

প্রোটেসট্যাণ্ট দেশগুলিতে বাইবেল পড়া হয়। এই উপাসনা পুস্তিকা ও বাইবেল ইউরোপের কোটি কোটি লোককে পুনরায় নিরক্ষর হইবার পথে জোড়াকাঁটা।

আমাদের উচিত রামায়ণ-মহাভারতের আরও সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করা ও সম্ভব হইলে পাঠশালা-পাস করার সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক বালককে একখণ্ড রামায়ণ অথবা মহাভারত বিনামূল্যে দেওয়া। আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছি।

কিন্তু প্রশ্ন, তাহাতে লাভ কি? ধর্মচর্চা (?) তো আমরা বিস্তর করিয়াছি, আর না হয় নাই করিলাম। তবে কি দেশের লোককে নিরক্ষরতা হইতে আটকাইবার অন্য কোন উপায় নাই, অথবা ধর্মপুস্তকের উপর আরও কিছু দেওয়া যায় না?

যায়। এবং সেই উদ্দেশ্যেই খবরের কাগজের শরণাপন্ন হইয়াছি। এই খবরের কাগজই তাহার উপায়।

রামায়ণ-মহাভারত সস্তায় অথবা বিনামূল্যে বিতরণ করিবার মত অর্থ কোন গৌরী সেনই দিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু তিনদিনের বাসি খবরের কাগজ বিলাইয়া দিতে অনেকেই সম্মত হইবেন। আমাদের কল্পনাটি এইরূপ—প্রথমতঃ, বড় ও ছোট শহরে যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক সাপ্তাহিক (ও পরে মাসিক) কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যে সব ছেলেরা পাঠশালা-পাস করিয়াছে, বিশেষ তাহাদেরই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাকখরচা লাগিবে। উপস্থিত সে পয়সা তুলিতে হইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্ধরা যে রকম বিনা ডাকখরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকম যথারীতি আন্দোলন করিলে ও বিশেষতঃ যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনা বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে, তাহা হইলে ডাকখরচও লাগিবে না।

রোজই যে কাগজ পাঠাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রথম দিকে সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার পাঠাইলেই চলিবে।

কিন্তু সংবাদপত্র ইহারা পড়িবে কি? এইখানেই আসল মুস্কিল। কাজেই—

দ্বিতীয়তঃ, পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে ছেলেদের পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যে সব লেখা বাহির হয়, তাহা পড়াইবেন। পরে নানারকম দেশী খবর, খেলার বর্ণনা, জিনিসপত্রের বাজার দর, আইন-আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলা, সাহিত্যিক প্রবন্ধ, যুদ্ধের খবর, সম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাঁহারা নৈশ ইস্কুল চালান প্রথম দিকে তাঁহারা এই প্রচেষ্টা করিলে ভাল হয় পরে—

তৃতীয়তঃ, গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকদের শিখাইতে হইবে কি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে ও পড়াইতে হয়। ইহার জন্যও আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে।

আমি অতি সংক্ষেপে খসড়াটি নিবেদন করিলাম। আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজ পড়বার সখ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ নহে। আর কিছুটা সুখ পাইলেই বালক সপ্তাহে দুইবার দুইখানা কাগজ স্বনামে পাইবার গর্বে নিশ্চয় পড়িবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ হইবে যে, গণ আন্দোলনের জন্য আমরা গ্রামবাসীকে প্রস্তুত করিতে পারিব।

পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক আমরা অনেকদিন যাবৎ ভাবিয়াছি ও আমি নিজে বাড়ীর চাকরদের কাগজ পড়িতে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছি। পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিলে পরিকল্পনাটি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে পারিব।

২

বিপদ এই যে, চতুর্দিক হইতে রাশি রাশি খবর রোজ খবরের কাগজের আপিসে উপস্থিত হইতেছে, অথচ কাগজের অনটন। অর্থাৎ খবর আছে, কাগজ নাই। কাজেই খবর-কাগজ সমাসটি সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এদিকে আবার দেশহিতৈষীরা নিরক্ষরতা দূর করিবার অন্যান্য উপায় জানিতে চাহিতেছেন। বিষয়টি গভীর—আলোচনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ত্রৈমাসিকের উপযুক্ত; অথচ খবরের কাগজের ভিতর দিয়া হাজার হাজার লোককে সমস্যাটি না জানাইলে প্রতিকারের সম্ভাবনাও নাই।

পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, চীন যে জনসাধারণের শিক্ষাপ্রসার ব্যাপারে এত পশ্চাৎপদ তাহার প্রধান কারণ চীনভাষার কাঠিন্য। সে ভাষায় বর্ণমালা নাই। প্রত্যেকটি শব্দ একটি বর্ণ। শব্দটি যদি না জানা থাকে তবে উচ্চারণ পর্যন্ত করিবার উপায় নাই; কারণ উচ্চারণ তো করি বর্ণে বর্ণ জুড়িয়া।

প্রত্যেকটি শব্দই যখন বর্ণ তখন হাজার হাজার বর্ণ না শিখিয়া চীনা পড়িবার বা লিখিবার উপায় নাই। ৪৭টি স্বরব্যঞ্জন শিখিতে ও শিখাইতে গিয়া আমরা হিমসিম খাইয়া যাই। চীনা সাক্ষররা কি করিয়া হাজার হাজার ও পণ্ডিতেরা কি করিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ণ শিখেন সে এক সমস্যার বিষয়। শুনিয়াছি চৌদ্দ বছরের বাঙালী ছেলে যে পরিমাণ বাঙলা জানে ততটুকু চীনা শিখিতে গিয়া নাকি সাধারণ চৈনিকের বয়স ত্রিশে গিয়া দাঁড়ায়। শুধু একটি কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। পুনা ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বাসুদেব গোখলে (বিখ্যাত গোখলের আত্মীয়) শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে চীনা শিখতে আরম্ভ করেন; পরে জর্মনীতে ডক্টরেট পান। ভদ্রলোক এখনও চীনা ভাষার অক্টোপাস-পাশ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার সতীর্থরা ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ন নানা ভাষা শিখিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুত গোখলের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করিবার কারণ অবশ্য নাই; চীনা ছাত্র এদেশে আসিয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট চীনা বৌদ্ধশাস্ত্র পালিশাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে শিখে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নূতন বর্ণমালা না চালাইলে চীনের জনসাধারণ কখনও সাক্ষর হইতে পারিবে না। জাপানীদের বর্ণমালা আছে।

বাঙলা বর্ণমালা সংস্কৃত নিয়মে চলে বলিয়া তাহার শ্রেণী বিভাগ সরল ও যুক্তিযুক্ত। ইংরাজী ও অন্যান্য সেমিটিক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করিলেই তথ্যটি স্পষ্ট হইবে। কিন্তু, এইখানেই সমস্যার জগদ্দল 'কিন্তু' উপস্থিত—লেখা ও পড়ার সময় বাঙলা বর্ণমালা যে কি অপূর্ব কাঠিন্য সৃষ্টি করে তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। দুইটি 'ই'কার কেন, দুইটি 'উ'কার কেন—উচ্চারণে যখন কোন প্রভেদ নাই তখন মনে রাখি কি করিয়া, 'কই' যখন লেখা যায় তখন 'কৈ'র কি প্রয়োজন? 'বউ' যখন লেখা যায় তখন 'বৌ'কে বরণ করিবার কি দরকার? 'গিআ', 'গিএ'র পরিবর্তে কেন 'গিয়া' 'গিয়ে'? এই সব প্রশ্ন শিশুমনকে বিক্ষুব্ধ করে ও সে সমস্ত ব্যাপারটার কোন হদিস পায় না—কারণ সংস্কৃতে তার হদিস আছে, বাঙলা লিখন-পঠনে নাই। দ্বিতীয়ত অযৌক্তিকতা; 'কা' লিখিতে 'আ'কার জুড়ি পশ্চাতে, কিন্তু 'ই'কার জুড়ি অগ্রভাগে, আর 'ঈ'কার জুড়ি পশ্চাতে, দুইটি 'উ'কার জুড়ি নীচে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক 'ও'কার ও 'ঔ'কার। প্রথম 'ে' লাগাই, তারপর লাগাই 'া'। ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই পড়িতে শুনিয়াছেন 'ঘ' একারে ঘে; উহুঁ ঘ আকারে আ, উহুঁ ঘে? ঘা? তখন তাহার মনে পড়ে 'ও'কারের কথা; বলে 'ঘো'—'ঘোড়া'। 'ঔ'কার তো

আরো চমৎকার। 'আ'কার 'ই'কার 'উ'কার, 'ঋ'কার সব কয়টি হয় আগে, নয় পশ্চাতে লাগাইলে যে কি আপত্তি ছিল, তাহা আমি বহু গবেষণা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। শিশুর পক্ষে সরল হইত, বয়স্ককে পুনর্নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিত। ইংরাজিতে ব্যাপারটা কানুনমাফিক ও সরল।

তবুও শিশুরা সাধারণতঃ সামলাইয়া লয়, কিন্তু যুক্তাক্ষরে আসিয়া তাহাদের বানচাল হয়।

আমার সবইনসপেকটর বন্ধুটি বলিয়াছেন যে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কৈবর্ত জেলের ছেলে বেশীর ভাগ পাঠশালা পালায় যুক্তাক্ষরের যুগে, দ্বিতীয় ভাগ পড়িবার সময়। যুক্তাক্ষর হইয়াছিল সংস্কৃত বানানের অনুসরণে। নিয়ম এই, কোনো ব্যঞ্জন যদি একা দাঁড়ায় তবে ধরিয়া লইতে হইবে তাহার সঙ্গে 'অ' স্বর যুক্ত আছে। তাই 'কর-ভ'তে তিনটি 'অ' যোগ দিয়া পড়ি। কিন্তু যদি কোনো ব্যঞ্জন স্বরের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতে চাহে, তবে তাহাকে পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে—অন্যথায় পূর্ব নিয়মানুসারে 'অ'কার লাগিয়া যাইবে। তাই 'সন্তপ্ত' বলিতে তাহার 'ন' আধা অর্থাৎ হসন্ত, 'প' আধা অর্থাৎ হসন্ত। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু বিপদ এই যে, যুক্তাক্ষর হওয়া মাত্রই অনেকেই এমন চেহারা বদলায় যে, তাহাদিগকে চিনে তখন কার সাধ্য—লাইনো টাইপের অর্থাৎ 'আনন্দবাজারে'র ছাপার কথা হইতেছে না, প্রচলিত ছাপা ও লেখার কথাই বলিতেছি। দ্বিতীয় বিপদ, এই আইন সংস্কৃতে অতি প্রাঞ্জলভাবে চলে বটে, বাঙলায় চলে না। লিখিতেছি 'রামকে' অর্থাৎ রা+ম+অ+কে অর্থাৎ 'রামোকে' (কারণ ব্যঞ্জন একা দাঁড়াইলে 'অ' বর্ণ যুক্ত হইবে—'অ' ছাপায় আলাদা বুঝাইবার উপায় নাই বলিয়া ও' কার ব্যবহার করিয়াছি), অথচ পড়িতেছি এমনভাবে যে 'ম' ও 'ক' যুক্তাক্ষরে লেখা উচিত; যথা 'রাম্‌কে'। 'সরব না'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে তো লেখা উচিত 'সর্ব না'; 'যাক সে'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে লেখা উচিত 'যাক্ষে' অথবা 'যাক্সে'। 'কখন জাগলি' = 'কখন জাগ্লি'; 'কাঁপলেই' = 'কাঁপ্লেই' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সবাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, লিখিতেছি 'সূক্ষ্ম', বলিতেছি 'শুকখ্ম'; লিখিতেছি 'আত্মা' বলিতেছি 'আত্তা'; লিখিতেছি 'ঊর্দ্ধ', বলিতেছি 'ঊর্দো' বা 'ঊর্ধো'—'দ' 'ব' অথবা 'ধ' 'ব' বৃথাই লেখা হইতেছে। শিশু যখন পড়ে স+উ+ক+ষ+ম, সে উচ্চারণ করিতে চাহে—শুদ্ধ সংস্কৃতে যে রকম করা হয় —সুকষম। কিন্তু বেচারাকে চোখের জলে নাকের জলে 'শুদ্ধ' উচ্চারণ শিখিতে হয়। সংস্কৃতে যাহা যুক্তিযুক্ত, বাঙলাতে তাহা খামখেয়ালি।

তাই দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে বেশীর ভাগ ছেলে যুক্তাক্ষরের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া অক্কা পায়। তাই দেখা গিয়াছে, বয়স্ক সাক্ষর বহুদিন লেখাপড়া চর্চা না করিয়া যদি পুনরায় পড়িতে বা লিখিতে যায়, তখন সেই এককালীন সাক্ষর টক্কর খায় যুক্তাক্ষরে।

আমাদের লিখন ও উচ্চারণের বৈষম্য এত বিকট যে, ইহাই নিরক্ষরতা ও সাক্ষরের নিরক্ষরতায় পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

কিন্তু উপায় কি?

অদ্যকার লেখা শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা না বলিয়া শান্তি পাইতেছি না। যখন গড়িমসী করিতেছিলাম, এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করিব কি না, তখন হঠাৎ দেখি সোমবারের 'আনন্দমেলা'য় একটি বালক—বালক মাত্র—বলিতেছে যে, সে 'নিরক্ষরকে সাক্ষর করা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ, আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে। বালকটিকে আমার আশীর্বাদ, সে আমাকে মনের জোর দিয়াছে।

৩

গত আগস্ট* মাসে উপর্যুক্ত শিরোনামায় দুইটি রচনা নিবেদন করিয়াছিলাম। সত্যপীরের বয়স তখন অতি অল্প; তাহার বালসুলভ চপলতা কেহই লক্ষ্য করিবে না, এই ভরসায় উপযুক্ত বিষয় লইয়া তখন অত্যধিক বাক্যাড়ম্বর করি নাই। কিন্তু বাংলা দেশে সহৃদয় পাঠকের অভাব নাই। তাঁহারা লেখা দুইটি পড়িয়া এযাবৎ অধমকে বহু পত্রাঘাত করিয়াছেন। তুলসীদাসের চৌপদীটি মনে পড়িল :—

জো বালক কহে তোতরী বাতা
সুনত মুদিত নেন পিতু অরু মাতা
হসিহহি কুর কুটিল কুবিচারী
জো পরদোষভূষণধারী

"বালক যখন আধ আধ কথা বলে, তখন পিতা এবং মাতা মুদ্রিত নয়নে (সন্তোষ সহকারে) সে বাক্য শ্রবণ করেন, কিন্তু ক্রূরকুটিল কুবিচারীরা শুনিয়া হাসে—তাহারা তো পরদোষ ভূষণধারী"।

---

* ১৯৪৬-এর আগস্ট মাস।

(তুলসীজীর রামায়ণখানা হাতের কাছে নাই; সদাশয় সরকারের ন্যায় দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত পচা চাউল অর্থাৎ আমার ক্ষীণ স্মৃতিভাণ্ডার হইতে চৌপদীটি ছাড়িলাম—হাজরা লেনের শ্রীমতী—ঘোষের সহযোগের উপর নির্ভর করিয়া)।

সহৃদয় পাঠকেরা 'মুদিত নেন' শুনিয়া এখন মুক্তকণ্ঠে আমাকে বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছিলাম ;—

প্রথমতঃ বড় ও ছোট শহরের যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক, সাপ্তাহিক (ও পরে) মাসিক কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যে সব ছেলেরা পাঠশালা পাস করিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাদেই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাক-খরচা লাগিবে। উপস্থিত সে-পয়সা তুলিতে হইবে কিন্তু আমার বিশ্বাস, অন্ধেরা যে রকম বিনা ডাক-খরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকমই—যথারীতি আন্দোলন করিলে, ও বিশেষতঃ যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনাটি বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে—ডাক-খরচাও লাগিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে ছেলেদিগকে পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যে-সব লেখা বাহির হয় ('আনন্দমেলা' জাতীয়) তাহা পড়াইবেন। পরে নানা রকম দেশী খবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরের কাগজের মাধুকরী করা ও তৎপর বণ্টনকর্ম সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা কেহ কেহ চাহিয়াছেন।

প্রথমেই নিবেদন করি যে, এই প্রকার সম্পূর্ণ নবীন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্বে আটঘাট বাঁধিয়া ফুলপ্রুফ কোন স্কীম বা প্ল্যান করা ঠিক হইবে না। শহর ও গ্রামের বাতাবরণ বিভিন্ন, কাজেই একই প্ল্যান দুই জায়গায় বলবৎ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম প্রচেষ্টা ডিনেমিক, চলিষ্ণু বা প্রাণবন্ত হইবে অর্থাৎ কাজ করিতে করিতে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, উনিশ-বিশ ফেরফার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সহৃদয় পাঠক যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলি যে, আমাদের দেশে সর্বপ্রচেষ্টায় আমরা বিলাতি ফিটফাট তৈয়ারী মডেল খুঁজিয়া তাহার অনুকরণ চেষ্টা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের ট্রেন-জাহাজ,

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের নৃত্যগীতের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা ইস্তেক জাতীয় সংগীত শুনিবার সময় দণ্ডায়মান হওয়া সর্বত্রই অনুকরণ-প্রচেষ্টা, মডেল খোঁজা—বাতাবরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া চলিষ্ণু ক্রমবর্ধমান শিশু-প্রচেষ্টাকে বলিষ্ণু করিতে শিখি না। আমাকে দোষ দিবেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের কি রকম অন্ধানুকরণ করে, তাহা দর্শাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে অনেকগুলি মর্মন্তুদ সত্য বলিয়াছিলেন।

আমার মনে হয়, উপর্যুক্ত বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করা প্রশস্ত।

প্রথমতঃ, কর্মী যুবকগণ মিলিত হইবেন ও কে কে বাসি কাগজ দিতে সম্মত হইবেন তাহার ফর্দ প্রস্তুত করিয়া যে খবরের কাগজ সরবরাহ করে তাহারই দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া কাগজ জমায়েত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, স্কুল সব-ইনস্পেক্টর মহোদয়কে আক্রমণ করা। অতি সবিনয়ে তাঁহার সম্মুখে প্ল্যানটি উপস্থিত করিতে হইবে—অতি সবিনয় অতি সভয়। তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে অর্ধেক কেল্লা ফতেহ। তাঁহার সহযোগিতায় যে যে পাঠশালায় প্রধান শিক্ষক শুধু বেতন কমাইয়াই (সে কত অল্প আমি জানি, কাজেই ব্যঙ্গ করিতেছি না) সন্তুষ্ট নহেন তাহার ফর্দ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শহরে একটি সভা করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিতে হইবে।

তখন যে কর্মপদ্ধতি স্থির করা হইবে তাহাতে যত ভুলচুকই থাকুক তাহাই ঠিক। অধমের পদ্ধতির প্রতি তখন যেন কোনো অহেতুক করুণা না দেখানো হয়।

সন্তর্পণে 'ঝোপ দেখিয়া কোপ' মারিতে হইবে, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ট্যাক্ট সহযোগে মাস্টার মহাশয়দের সদয় সহযোগ না পাইলে সব গুড় মাটি হইয়া যাইবে।

যদি সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে বোর্ডের চেয়ার-ভাইস-চেয়ারম্যান তদভাবে কোনো মুরুব্বী মেম্বরের সাহায্য লইয়া কাজ করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি নিজে সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়গণের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা রাখি। যে সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়কে স্মরণ করিয়া প্রথম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এ বিষয়ে আপ্রাণ সাহায্য করিবেন ও আমার অন্ধ বিশ্বাস, তাঁহার মত জীবন্ত কর্মী বাঙলা দেশে আরও আছেন।

কাহারো সাহায্য না পাইলেও কাজ আরম্ভ করা যায় শুদ্ধ গুরুমহাশয়কে

যদি দলে টানা সম্ভবপর হয়। তিনি রাজী হইলে বাকী সব কিছুই সরল।

যাঁহারা নৈশ বিদ্যালয় চালান তাঁহাদের পক্ষে কর্মটি তো সরলই।

এতটা কাজ আগাইলে পর কর্মীরা যদি আমাকে পত্র লিখিয়া সুবিধা অসুবিধার কথা জানান, তবে আমি তাঁহাদিগকে সোজা উত্তর দিব ও সম্ভব হইলে দুর্বল শরীর সত্ত্বেও সরজমিনে উপস্থিত হইয়া যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভব তাহা নিবেদন করিব।

কি পড়াইতে হইবে, কোন্ কায়দা পড়াইতে হইবে, সে আলোচনা বারান্তরে করিব। ইতোমধ্যে এই শীতকালই কাজ আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত।

সর্বশেষে আমাদের কাগজের 'আনন্দমেলা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য (১৪৪১৬) দর্শনা মণিমেলা, নদীয়া—গত ১৭ই অগস্টের আনন্দবাজারে 'সত্যপীরে'র লেখা নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করানোর যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তা তুমি পড়েছ জেনে খুশী হলাম। 'মণিমেলা'র অন্যান্য বন্ধুরা ঐ লেখাটি পড়ে এদেশের নিরক্ষরতা দূর করবার সহজ কতকগুলি পন্থা ধরে কাজ করার চেষ্টা করবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি।"

বালক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে আমরা অতশত দুর্ভাবনা করি কেন।

উচ্চারণ

প্রবাদ আছে, বঙ্গদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ এককালে এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ (কেহ কেহ বলেন ক্ষিতীশ, মেধাতিথি) ইত্যাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহারা এদেশের লোককে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কতটা শিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আমাদের জানামতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদেশে আবার সেই চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া বহু বাঙালী বিদ্যার্থী কাশীতে সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উচ্চারণও এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমন কি কাশী প্রত্যাবৃত্ত কোনো কোনো বাঙালী পণ্ডিতকে আমরা খাঁটি বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত পড়িতে শুনিয়াছি। সন্দেহ হইতেছে খাস কাশীতেও বাঙালী চালিত টোলে বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ শিখানো হয়।

বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক তাহা একটি সামান্য উদাহরণ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে

ইতালির খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক তুচ্চি কলিকাতার তৎকালীন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম উচ্চারণ করেন। বাঙালী যে কায়দায় করে, সেই কায়দায়ই করিলেন, অনেকটা 'জাগেগাঁবোল্কোর' ন্যায়। তুচ্চি তো কিছুতেই বুঝিতে পারেন না কাহার কথা হইতেছে। পণ্ডিতের চক্ষুস্থির যে তুচ্চির মত লোক যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শোনেন নাই। তুচ্চি প্রত্যাশা করিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ. অনেকটা Yajnyavalkya-র ন্যায়, শুনিতেছেন Jaggonbolko, বুঝিবেন কি প্রকারে যে একই ব্যক্তি!

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ এতই কর্ণপীড়াদায়ক যে, আমাদের পরিচিত দুইটি পশ্চিম-ভারতীয় ছাত্রকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। 'পরশুরামে'র 'গণ্ডেরীজী' মেঘনাদবধকাব্য উচ্চারণ করিলে আমাদের কর্ণে যে পীড়ার সঞ্চার হইবে, আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয়দের সেই রকমই পীড়া দেয়।

বাঙালী সংস্কৃত ব্যঞ্জনের ঞ, ণ, ষ, অন্তস্থ ব, ষ, স উচ্চারণ করিতে পারে না ও যুক্তাক্ষরের (আত্মা, যক্ষ ইত্যাদি) উচ্চারণে অনেকগুলি ভুল করে। স্বরবর্ণের অ, ঐ, ঔ ভুল উচ্চারণ করে ও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এই যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘস্বরের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। তাহাতে বিশেষ করিয়া 'মন্দাক্রান্তা' পড়িলে মনে হয় ভগবানের অপার করুণা যে, কালিদাস জীবিত নাই।

বাঙালী যখন আরবী উচ্চারণ করে, তখন এই মারাত্মক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়। বাঙালী (কি হিন্দু কি মুসলমান) আরবী বর্ণমালার সে, হে, জাল, স্বাদ, দ্বাদ, ত্বয়, জয়, আইন, গাইন, কাফ, হামজা, অর্থাৎ বর্ণমালার ৪, ৬, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২৯ ভুল উচ্চারণ করে ও সংস্কৃতে হ্রস্ব দীর্ঘ যেমন অবহেলা করিত, সেই রকমই আরবীতেও স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘের কোন পার্থক্য করে না। কিন্তু শুধু কোরান পাঠের জন্য এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁহাদিগকে 'কারী' বলে; দ্রাবিড়ে যেমন সামবেদ গাহিবার জন্য এক শ্রেণীর বিশেষ আইয়ার—আয়ঙ্গার ব্রাহ্মণ আছেন। বাঙালী কারীরা দীর্ঘ-হ্রস্ব মানেন ও ব্যঞ্জনে শুধু ৪, ৯, ১৫-তে ভুল করেন।

আমরা সংস্কৃত উচ্চারণে ভুল করি তাহার প্রধান কারণ, আমরা আর্য-সভ্যতার শেষ সীমা-প্রান্তে বাস করি। (আর্য-সভ্যতা বাংলা ছাড়াইয়া বর্মায় যাইতে পারে নাই ও বালী জাভায় বিকশিত হইল বটে, কিন্তু প্রাণধারণ করিতে পারিল না)। আমাদের ধমনীতে আর্য-রক্ত অতি কম বলিয়াই আর্য উচ্চারণ

করিতে অক্ষম হই। আমরা যে আরবী উচ্চারণ করিতে পারি না, তাহাও ঠিক সেই কারণেই। আরবী সেমিতি ভাষা, তাহার যে সব কঠিন উচ্চারণ মুখের নানা গোপন কোণ হইতে বহির্গত হয়, তাহা বাল্যকাল হইতে না শুনিলে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

গত শুক্রবারে রেডিয়োতে কুরান পাঠ ও শনিবারে সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ ও উভয়ের বাঙলা অনুবাদ ও টিপ্পনী শুনিয়া উপরোল্লিখিত চিন্তাধারা মনের ভিতর তরঙ্গ খেলিয়া গেল। রেডিয়োর কুরান পাঠ মুসলমানদের কাছে আদর পাইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহারা যে কান দিয়া শুনেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক বৃহৎ মুসলমান পরিবারে লক্ষ্য করিয়াছি, বুড়া কর্তারা রেডিয়োটা দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, দুই কানে শুনিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস ইসলামে সংগীত অসিদ্ধ ও ঐ যন্ত্রটি সেই সব শয়তানী জিনিস লইয়া কারবার করে, ছোকরাদের বিগড়াইয়া দেয়। অথচ শুক্রবার সকালবেলা দেখি গুড়িগুড়ি রেডিয়োঘরের দিকে চলিয়াছেন তাবৎ বুড়া-বুড়ীরা। আধ ঘণ্টা পূর্ব হইতে কলিকাতা ছাড়া অন্য কোন বেতারকেন্দ্রে রেডিয়ো জুড়িবার উপায় নাই। তারপর মুদ্রিত চক্ষে ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়ে অতি নীরবে কোরান পাঠ শ্রবণ করেন। অনুবাদ ও টিপ্পনী কেহ শোনেন, কেহ শোনেন না।

এই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতি কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তব্য আছে।

যে-কারী সাহেব কুরান পাঠ করিলেন, তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী কারী অপেক্ষা ভালো সন্দেহ নাই। তাঁহার দীর্ঘ হ্রস্ব দুরস্ত, তাঁহার 'আইন কাফ হে' ঠিক, কিন্তু তাঁর 'সে' 'জাল' ও 'দ্বাদ' (৭, ৯, ১৫) বারে বারে দুঃখ দেয়, বিশেষ করিয়া 'সে' ও 'জাল', কারণ 'ইজা' (যখন) ও 'সুম্মা' (তৎপর) দুইটি কথা আরবীতে এবং সর্বভাষাতেই ঘন ঘন আসে।

কারী সাহেবের বাঙলা উচ্চারণে আরবীর গন্ধ পাওয়া যায়—পাদ্রী-সাহেবের বাঙলাতে যে রকম ইংরিজি গন্ধ আমাদিগকে পীড়িত করে আমরা বাঙলায় বলি 'যখন' (যখোন), কারী সাহেব বলেন 'য্যখ্যন' যেন 'য' ও 'খ'-র ভিতরে আরবী আকার বা জবর রহিয়াছে।

শাস্ত্র যিনি পাঠ করিলেন তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী অপেক্ষা শতগুণে ভালো সন্দেহ নাই কিন্তু কোনো মারাঠী বা যুক্তপ্রদেশীয় পণ্ডিত সে উচ্চারণের প্রশংসা করিবেন না। তাহার প্রধান কারণ যে শাস্ত্র-পাঠকের হ্রস্ব-দীর্ঘ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রস্ব ও যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ নহে। হ্রস্ব দীর্ঘে তিনি এত সামান্য পৃথক করেন যে, যানান জানা সত্ত্বেও কানে ঠিকঠিক বাজে না। তাঁহার বাঙলা

উচ্চারণও পণ্ডিতী অনেকটা কথক-ঠাকুরদের মত।

দুইজনেরই অনুবাদ ও টীকা নৈরাশ্যজনক। প্রভু ইসা (খৃষ্ট) ও হাওয়ারি-গণের বর্ণনা বাঙলার মুসলমান কি প্রকারে বুঝিবে, তাহাকে যদি বেশ কিছুদিন ধরিয়া প্যালেস্টাইনের ইতিহাস ও ভূগোল না শোনানো হয়। সকলেই তো শূন্যে ঝুলিতে থাকিবেন ও শাস্ত্র শোনা হইবে বটে, কিন্তু বোঝা বা আলোচনা তো হইবে না।

শাস্ত্র-পাঠক যে উর্ধ্বশ্বাসে অনুবাদ ও টীকা করিয়া গেলেন তাহাতে আমার মত মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারিল না। টোলে কৃতবিদ্য ছাত্রকে যে ধরনে দ্রুত-গতিতে টীকা শোনানো হয়, ইহার অনেকটা তাই। সাধারণ বাঙালী ধর্মতৃষিতকে আরো সরল, আরো সহজ করিয়া না বুঝাইলে টীকাদান পণ্ডশ্রম হইবে।

কারী সাহেব ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; আমরা জানি তাঁহারা যে কোনো মসজিদ-মাদ্রাসা, যে কোন টোল-চতুষ্পাঠীতে সম্মান ও আদর পাইবেন—আমরাও দিব। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর উচিত আরো ভালো আরো উত্তম, এক কথায় সর্বোত্তম কারী সর্বোত্তম শাস্ত্র পাঠক আনয়ন করা। ইংরাজিতে বলে, 'সর্বোত্তম উত্তমের শত্রু'।

তাবৎ বাঙলা ও কিছু কিছু বিহার উড়িষ্যা আসামকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে উচ্চারণ পরিবেশন করা হয় তাহার জন্য রেডিয়ো কর্তাব দায়িত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি অনেক বেশী হওয়া উচিত ও তাঁহাদিগের অনেক পরিশ্রম করিয়া সর্বোত্তম কারী-শাস্ত্রী সন্ধান করা উচিত। অথবা অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করা উচিত।

শুনিয়াছি মিশরের কারী রেফাৎ রমজান মাসে কুরান পাঠের জন্য ১৩০০ টাকা পারিশ্রমিক পান ; কাইরো কলিকাতা অপেক্ষা ধর্মপ্রাণ একথা কে বলিবে ?

সর্বশেষে বক্তব্য, পাঠক যেন না ভাবেন, মন্দ উচ্চারণে আমরাই একা। আর্যসভ্যতার অন্য প্রান্ত অর্থাৎ ইংলণ্ডের অবস্থাও তাই। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতদের লাতিন উচ্চারণ শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। তবে ইংলণ্ডে উচ্চারণ শুদ্ধ করিবার জন্য জোর আন্দোলন চলিতেছে, এদেশে—থাক্ সে কথা।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়াছেন শ্রীযুত—মুখোপাধ্যায়, কাব্য-ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, এহেন পণ্ডিতের সঙ্গে উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি আলোচনা

করিতে পারি, কিন্তু তর্ক করিবার মত যুগ্ম মস্তক স্কন্ধে নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ বাক্য আমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া তর্কাতর্কির বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার শেষ বাক্য "সকল কথার পর তবুও স্বীকার্য যে, বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ", কিন্তু তাহার পূর্বে 'সকল কথার' মাঝখানে শাস্ত্রী মহাশয় এমন কথাও তুলিয়াছেন যেখানে অধম কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিবে। শাস্ত্রী মহাশয় (এবং অন্যান্য সহৃদয় পত্র-প্রেরকও দর্শাইয়াছেন যে, অবাঙালী সংস্কৃত পণ্ডিত 'ষ' ও 'খ' তে পার্থক্য রাখেন না। কিন্তু তাহা হইতে কি সপ্রমাণ হয় ঠিক পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলেন নাই। ব্যঞ্জনায় বুঝিতেছি শাস্ত্রী মহাশয়ের বলার উদ্দেশ্য যে, যেহেতুক অবাঙালী পণ্ডিতও ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না, তবে বাঙালীরই বা দোষ কি?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মারাঠী, দ্রাবিড় ও কাশীর পণ্ডিত যখন সংস্কৃত উচ্চারণ করেন, তখন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ কিছু কিছু পার্থক্য তাঁহাদের উচ্চারণের মধ্যে থাকে। ঐ সব পণ্ডিতের একে অন্যের উচ্চারণে যে পার্থক্য তাহা যেন একইরঙের পৃথক পৃথক ফিকা ভাব অথবা গাঢ়। বাঙালীর উচ্চারণ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ। দক্ষিণের আইয়ার হয়ত যতটা দীর্ঘ করিলেন, উত্তরে কাশীবাসী হয়ত ততটা করিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙালী যে অত্যন্ত পৃথক কিছু উচ্চারণ করে তাহা এই তথ্য হইতে সপ্রমাণ হয় যে আইয়ার, নম্বুদ্রী, চিতপাবন, দেশস্থ, করাঢ় (এমন কি মহারাষ্ট্রের 'দেশস্থ' ও ঔপনিবেশিক 'দ্রাবিড়স্থ'), উদীচী, ভার্গব, নাগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গণ ও তাঁহাদের শিষ্য অব্রাহ্মণগণও একে অন্যের উচ্চারণের পার্থক্য লইয়া ঈষৎ আলোচনা করিয়া একটি সাধারণ রূপ বা নর্ম (norm) স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙালীর উচ্চারণ যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং পরস্পর-বিরোধিতায় কণ্টকাকীর্ণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

(ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণের পার্থক্য হয় প্রধানতঃ দীর্ঘস্বরের দৈর্ঘ্য, হ্রস্বস্বরের হ্রস্বতা, 'ঋ', 'ঌ', ও 'ষ' লইয়া। সব কয়টির আলোচনা এক কলমে ধরাইবার মত কলমের জোর অধমের নাই। উপস্থিত 'ষ' লইয়া আলোচনা করিব, পরে প্রয়োজন হইলে অন্যান্যগুলির হইবে। 'ষ' যে 'খ' নয় সে বিষয়ে তর্ক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু 'ষ'-এর উচ্চারণ কেন 'খ' হইল তাহার আলোচনা করিলে মূল 'ষ'-এর কিঞ্চিৎ নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথম দ্রষ্টব্য 'ষ' স্থলে বিদেশী পণ্ডিত যখন 'খ' বলেন, তখন তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত; কেহ কেহ উচ্চারণ করেন পরিষ্কার 'খ' অর্থাৎ 'ক' বর্গের মহাপ্রাণ 'খ' এবং কেহ কেহ উচ্চারণ করেন ঘর্ষণজাত আরবীর 'খ'—কাবুলীরা যে রকম 'খবর' বলে, স্কচরা

যে রকম 'লখ' 'LOCH' বলে, জর্মনরা যে রকম 'BACH' বলে। এই দ্বিতীয় 'খ' উচ্চারিত হয় পণ্ডিত যখন 'ষ'-কে 'শ' হইতে পৃথক করিবার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া জিহ্বা মূর্ধা হইতে সরাইয়া আরও পশ্চাৎ দিকে ঠেলেন। এই কারণেই আর্যভাষা পশতুতেও তাহা দেখা যায়—কেহ বলে 'পশতু', কেহ বলে 'পখতু', কেহ বলে 'পেশাওয়ার', কেহ বলে 'পেখাওয়ার'। এই কারণে জর্মনে Becher-এর 'ch' 'ষ'-এর মত, অথচ Bach-এর 'ch' আরবী 'খ'-এর ন্যায়। 'ষ'-কে এই জাতীয় 'খ' করা অবশ্য ভুল, আমি মাত্র কারণটি ও নজীরগুলি দেখাইলাম। কিন্তু 'ষ'-এর আসল শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়া অনুচিত। অত্যধিক উৎকণ্ঠিত (উভয়ার্থে) না হইয়া মুখগহ্বরের যে স্থল অর্থাৎ মূর্ধা হইতে ট, ঠ, ড, ঢ ও পরে ঐ স্থলেই 'ষ' বলিলে মূর্ধণ্য 'ষ' বাহির হইবে।)

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন হিন্দুস্থান পার্ক হইতে শ্রীআচার্য। তাঁহার বক্তব্য "কোনও ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে তাহার সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং ধ্বনিতত্ত্বে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই"। আমাদের মতের সঙ্গে আচার্য মহাশয়ের মত মিলিল কিন্তু তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের প্রতিকূলতা নিবন্ধন যদি সেই ভাষার উচ্চারণে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহাতে কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।"

আচার্য মহাশয় তাঁহার চিঠিতে নিজের কোনও উপাধির উল্লেখ করেন নাই, অথচ পত্রখানি গভীর পাণ্ডিত্যে পূর্ণ। তাই প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছি না, অথচ উপরের নীতিটি এতই বিপজ্জনক যে, নিতান্ত অনিচ্ছায় করিতেছি। কারণ যদি এই নীতিই অনুসরণ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যেহেতু আমরা বাঙালী, আমাদের জাতীয় অভ্যাসের 'প্রতিকূল' হয় তাই আমরা F ও 'ফ'য়ের তফাৎ করিব না, th-এর শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিব না, কুরান বঙ্গীয় ইসলামী কায়দায় পড়িব, মন্দাক্রান্তার হ্রস্বদীর্ঘ না মানিয়া উদয়াস্ত কালিদাসকে জবাই করিব। এই নীতি আরো অনুসরণ করিয়া বলিব, আমরা বাঙালী বাঙলা ভাষার লিঙ্গ নাই, সংস্কৃত লিখিবার সময় লিঙ্গভেদ করিব না, দ্বিবচন মানিব না; হিন্দী বলিবার সময় 'একঠো', 'দুইঠো' করিব, 'গাড়ী আতা হৈ' বলিব—এক কথায় 'জাতীয় অভ্যাসের' দোহাই দিয়া বিজাতীয় কোনও ভাষাই তাহার স্বরূপে গ্রহণ করিব না; সুকুমার রায়ের—হ য ব র ল-য়ের দর্জীর ৩২ ইঞ্চি ফিতা দিয়া মাপিলে যেমন সব কিছু ৩২ ইঞ্চি হইয়া যাইত। আমাদের 'জাতীয় অভ্যাসের' বকযন্ত্রে চোলাই করা সর্ব উচ্চারণ শুদ্ধ এল্‌কহল হইয়া বাহির হইবে তাহার বর্ণগন্ধ

থাকিবে না।

'লজ্জা' বা শ্লাঘার কথা হইতেছে না ; অভ্যাসটি বাঞ্ছনীয়। বেদমন্ত্র ঠিক কি প্রকারে উচ্চারিত হইত জানি না, কিন্তু চেষ্টা তো করিতে হইবে জানিবার জন্য। সেই চেষ্টাতেই তো পণ্ডিতে ও আমাদের মত সাধারণ লোকের তফাৎ। যুক্ত-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মদ্র, গুর্জর পার্থক্য সত্ত্বেও একটি (norm) মানিয়া লইয়াছেন, নিরপেক্ষ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও সেটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—তবে আমাদের কর্তব্য কি ?

আচার্য মহাশয় ভুল উচ্চারণ চাহেন না, কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত যদি সে উচ্চারণের সপক্ষে এককাঁড়ি অজুহাত দেন, তবে আমাদের মত সরল লোক 'জাতীয় অভ্যাসের' তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া আরামে নিদ্রা যাইব—এই আমার ভয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভালো যে, যদিচ জাভার মুসলমান ও মক্কার মুসলমান এক রকম উচ্চারণে কুরান পড়েন না, তবু জাভার মুসলমান হামেশাল চেষ্টা করেন নর্মের (norm) দিকে অগ্রসর হইবার। পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের আরবী উচ্চারণ খারাপ, কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদ হামেসা চালু রাখেন বলিয়া তাহাদের আরবী উচ্চারণ বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষা নর্মের (norm-এর) অনেক কাছে।

আচার্য মহাশয় দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাজাত অন্যান্য মনোরম তথ্যও বলিয়াছেন। সেগুলি পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই জানা উচিত। সুবিধামত সেগুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

অন্যান্য চিঠিও পাইয়াছি, লেখকদের ধন্যবাদ। এ মূর্খকে জ্ঞানদান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার স্বীকার করি।

পরাজিত জর্মনী

জর্মনী হারিয়া গিয়াছে। দুঃস্বপ্ন কাটিয়াছে। সমর-নেতারা যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া আবার কুচকাওয়াজের সত্যযুগে ফিরিয়া যাইবার তালে পা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তার অবসান হইল না। বরঞ্চ এতদিন যে মাথা-ব্যথা শুদ্ধ সামরিক মাথাকে গরম করিয়া রাখিয়াছিল সে আজ রাজনৈতিকদের আহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সমস্যাটা এই, পরাজিত জর্মনীকে লইয়া কি করা যায়।

১৯১৮ সালে এ সমস্যা ছিল না। নিবীর্য রুশ তখন নিজের গৃহসমস্যা লইয়া ব্যস্ত। জর্মনী সম্বন্ধে সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৯৪৫ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুশ জর্মনীকে লইয়া কি ভেল্কিবাজী খেলবে, তাহা মিত্রশক্তির কর্তারা ঠিক আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অথচ দাবা খেলায় অন্য পক্ষের চালের জন্য যে রকম অবিচলিত চিত্তে বসিয়া থাকা যায় এস্থলে তাহা সম্ভবপর নয়।

জর্মনীকে মিত্রপক্ষের কোন্ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বলি দিবেন আর রুশরা কোন্ দগায় শিন্নি চড়াইবেন সে বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনা নাই। কারণ প্রসাদ আমরা পাইব না, পাইবার ইচ্ছাও রাখি না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত অশোভনীয় হইবে না। জর্মনী সম্বন্ধেই এযাবৎ যে কেতাবপত্র বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, খবরের কাগজে যে বাত্রিশভাজার পরিবেশন হইতেছে তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়—সকলেরই কিছু-না-কিছু স্বার্থ আছে। আমরা নিঃস্বার্থ, আমাদের মতামতে তাই কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষতা থাকিবে, আর কিছু না থাকুক।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো যে, জর্মনী বিশেষ করিয়া পরাজিত জর্মনী আমাদের শত্রু নয়, মিত্রও নয়। তবে নাৎসীদের আমরা চিরকালই অপছন্দ করিয়াছি। তাহার অন্যতম কারণ নাৎসীরা গায়ে পড়িয়া বহুবার ভারতবর্ষ ও তাহার সভ্যতার প্রতি কটূক্তি করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রজেনবের্গ সাহেবের 'বিংশ শতাব্দীর মিথ' নামক কেতাবে বিস্তর পাওয়া যায়। রজেনবের্গ সাহেবের পরিচয় বিশদভাবে দিবার প্রয়োজন নাই। হিটলার তাঁহাকে জর্মনীর 'আধ্যাত্মিক গুরু' (গাইসটস ফ্যুরার) বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

রজেনবের্গ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টিতে বৃহত্তম দান করিয়াছে, (ক) আর্যরা, (খ) আর্যদের মধ্যে আর্যতম আর্য হইলেন নীল চোখওয়ালা, সোনালী চুলওয়ালা নর্দিক জর্মনরা।

প্রথম তথ্য সম্বন্ধে রজেনবের্গ সাহেবের মনে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ রজেনবের্গের বহু পূর্বে ভিয়েনার খ্যাতনামা পণ্ডিত লেওপল্ড ফন শ্রোডার বহু যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রায় সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আর্যরা সেমাইট (ইহুদী ও আরব) ও মঙ্গলীয়দের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু নর্দিক জর্মনরাই যে সর্বোৎকৃষ্ট আর্য এ বিষয়ে রজেনবের্গের মনে ধোঁকা ছিল। কারণ আর্যসভ্যতা লইয়া যাঁহারা লম্ফঝম্প করেন তাঁহাদের প্রথমেই খবর লইতে হয় আর্যের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়। আর সে অনুসন্ধান

করিতে গেলেই স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক ভারতবর্ষের আর্যদের দ্বারস্থ হইতে হয়। কারণ ইউরোপীয় আর্যদের মাথার মণি গ্রীক সভ্যতার গোড়াপত্তনের পূর্বেই অন্ততঃ তিনখানা বেদের মন্ত্র রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, উপনিষদের ঋষি সক্রেটিসের পরম বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় বয়সে ও জ্ঞানে। কাজেই ভারতবর্ষীয় আর্যরা যদি আর্য জাতির ঠিকুজিকুষ্ঠি লইয়া বসিয়া থাকে তবে নর্দিকদের কি গতি হয়? রজেনবের্গ বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্যদের এই বিষয়ে কৌলীন্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্যকার ভারতবর্ষীয়রা সে আর্য নয়। "ইহারা জারজ, এখনও গঙ্গাস্নান করিয়া ইহারা নিজেদের বর্ণসংকর পাপের ক্ষালন করিবার চেষ্টায় সর্বদাই রত।" গঙ্গাস্নানের কি অপূর্ব অর্থ নিরূপণ ও সঙ্গে সঙ্গে নর্দিক কৌলীন্যের কি আশ্চর্য কুতুবমিনার নির্মাণ!

একথা আমরা আজ আর তুলিব না যে নর্দিক আর্যে বর্ণসংকর আছে কি না ও থাকিলে কি পরিমাণ। আমাদের বক্তব্য যে, রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসীরা যে আর্যামির বন্যায় জর্মন জাতকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজানা নহে। এ বন্যা আমাদের দেশেও এককালে বহিয়াছিল ও পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনীতিকে গণ্ডিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সালে কি বলিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি। রজেনবের্গের তখনও জন্ম হয় নাই।

"ম্যাকসমূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্বে আর্য বলিয়া যে একটি শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা (অর্থাৎ আর্যামির পাণ্ডারা) জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ম্যাকসমূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্যমন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহার দুই-এক রত্তি ছিটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে আর্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। বিলাত হইতে আর্যমন্ত্রের আমদানী হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য আর্য বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠে উদ্গীত আর্য নামের চীৎকার-ধ্বনিতে ইয়ং বেঙ্গলের গাত্রে থর থর কম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণদেব দানোয়া-পাওয়া শবদেহের ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে বসিয়া গেলেন এবং ফিরে-ফিতি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যাগায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

আমরা যেরূপ একদিন পৈতা মাজিতে ও সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে বসিয়া গিয়াছিলাম, রজেনবের্গ সাহেবও সেই রকম নর্দিক নীল চোখকে নীলতর ও সোনালী চুলকে সোনালিতর করার চেষ্টায় মশগুল হইলেন। আমরা যে রকম

ভুলিয়াছিলাম যে—

কর্ত্তব্যমাচরন্ কার্যমকর্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য ইতি স্মৃতঃ।

অর্থাৎ কর্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে দৃঢ়নিষ্ঠ হন তিনি আর্য শব্দের বাচ্য।

রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসীরাও এই মহাবাক্য ভুলিলেন।

আমরা একদিন ভুলিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের রাজনীতি সেদিন সম্প্রদায়-মুক্ত হইতে পারে নাই। পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'আর্যামির' হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এই আবহাওয়ায় আমাদের নাভিশ্বাস উঠে বলিয়াই জিন্না সাহেব যখন বলেন, 'কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান', তখন আমরা আপত্তি জানাই। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব 'আর্যামি' লইয়া থাকুন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসী আন্দোলনের ভাগ্যচক্রগতি দেখিয়া যেন পদক্ষেপ করেন।

নাৎসীদের এই দম্ভের চরম প্রকাশ হইল পৃথিবী জয়ের বাসনায়। তাহার পূর্বে জর্মনী জয়ের কার্যে তাহারা নিযুক্ত হইলেন। ইহুদীদের নির্যাতন; নাৎসী সাম্প্রদায়িকতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের উৎপীড়ন, এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দির হইতে হাইনে, আইনস্টাইন, মানী প্রভৃতি মৃত, জীবিত মনস্বীদের বহিষ্করণ।

বিচক্ষণ জর্মনরা যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই এমন নহে। শুধু বিচক্ষণেরাই যে নাৎসী-দর্শনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জর্মনীর জন-সাধারণও তাহাদের ব্যঙ্গোক্তি আড়ালে অন্তরালে অনেকখানি প্রকাশ করিয়া-ছিল। একটি ধাঁধাঁর ভিতর দিয়া সে ব্যঙ্গোক্তি তাহারা বিদেশীদের কাছে প্রকাশ করিত ও তাহাদের নাৎসী তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা লইত।

ধাঁধাঁটি এই—

প্রশ্ন: আদর্শ আর্য কে?

উত্তর: তাহার জন্ম হইবে ফ্যুরারের দেশে, সে বীর প্রসূ হইবেন গ্যোরিঙের ন্যায়, দৈর্ঘ্যে গ্যোবেলসের ন্যায়, নামে রজেনবের্গের ন্যায়, কার্যক্ষেত্রে ফন রিবেনট্রপের ন্যায়। (সকলেই জানেন হিটলারের জন্মভূমি জর্মনী নয়, গ্যোরিঙ ও গ্যোবেলসের একজন মোটা একজন বেঁটে; রজেনবের্গের নামে আছে ইহুদী নামের বোটকা গন্ধ ও রিবেনট্রপ শৌণ্ডিক।)

তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যামি জর্মনীতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল ; পরে সে আর্যামির দম্ভ চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিজিত দেশে, এমন কি ইতালীর ন্যায় মিত্ররাজ্যে (কাউন্ট চানোর অধুনা-প্রকাশিত রোজনামচা দ্রষ্টব্য) তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ যে রুশেরা বল্কানে অনেকটা সুবিধা পাইতেছে, তাহার কারণ এই নহে যে বল্কানরা সকলেই ভাবে যে, রুশ তাহাদের পরম মিত্র, বরঞ্চ যুক্তিধারা অনেকটা এই রকম : শত্রুর শত্রু মিত্র নাও হইতে পারে, কিন্তু মিত্রবৎ।

জর্মনীর নাৎসী কর্তারা কি রাজরাজেশ্বরের হালে দিন কাটাইতেন, সে সকলেই জানেন। গাঁজার নেশাটা করিলেন কর্তারা, মাথাধরাটা পাইল জন-সাধারণ। তাহারা প্রাণ দিল রুশিয়ার দুস্তর প্রান্তরে ক্ষুধায় শীতকষ্টে অথবা রুশনগরদ্বারে, রাস্তায় গলিতে গুলিতে বিস্ফোটকে ; অথবা নরমাংদিতে সামনে মিত্রশক্তির ট্যাঙ্ক, কামান, উপরে বোমারু, পিছনে ফরাসী গেরিল্লা—মাতা বসুন্ধরা তাহাদের আবেদন শুনিবার পূর্বেই বোমারু জাহাজ মাতার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল, কিন্তু হায়রে, সেখানেও আশ্রয় কোথায় ?

দেশের কথায় বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবর্ধন'। আজ সমস্ত জর্মনী জুড়িয়া যে বিকার ও ভবিষ্যতে যে কি সান্নিপাতিক জ্বর হইবে, তাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে শক্ত। ইংরাজ, আমেরিকান, রুশ ত্রিদোষ হইয়া জর্মনীর 'গোবর্ধন'গুলিকে কোন্ শ্মশানযাত্রায় লইয়া যাইতেছেন, তাহার খবর কে রাখে।

এতদিন খবর পাইতেছিলাম যে, রমাকান্তগুলিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা হইতেছে ও তাহারা যে বিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এমন নহে। তাহাদের জন্য বিশেষ গারদ, বিশেষ বিচার, এমন কি বিশেষ হাড়িকাঠও নির্মিত হইতেছে। ফাঁসী অথবা গুলির কর্ম নয়, খাস জর্মন কায়দায় তাহাদিগকে গিলোটিনে গলা দিতে হইবে। আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি না, আনন্দিতও হইতেছি না। আমরা ভারতবাসী ; কর্মফলে বিশ্বাস করি। দই খাইলে বিকার হইবেই। কিন্তু ইতোমধ্যে হঠাৎ একটি খবর পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। খবরটি এই—শ্লেজবীক-হলস্টাইনে নাকি প্রায় সোয়ালক্ষ জর্মন সৈন্য ও অফিসারকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের নিরস্ত্র করা হয় নাই। পাছে বিশ্বসুদ্ধ লোক খবর পাইয়া আঁতকাইয়া উঠে, তাই অত্যন্ত সান্ত্বনাপূর্ণ এই খবরটিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের কাছে রসদ মাত্র দশ রোঁদ চালাইবার মত। যে অঞ্চলে এই নোনা ইলিশরা বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহারা সর্বময় কর্তা, এমন কি সে অঞ্চলে যদি তাঁহাদের থানাপিনার অসুবিধা হয়, তবে পার্শ্ববর্তী জর্মনী ও

সম্ভবতঃ ডেনমার্ক হইতে আহারাদি যোগাড় করিতে পারিবেন। হেমলেটি ভাষায় বলি, 'ইহারা যে পাঁড় নাৎসী, সেকথা জানাইবার জন্য দৈববাণীর প্রয়োজন নাই।'

সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও পাইলাম যে, প্রায় ৪৫ মিলিয়ন পাউণ্ড খরচা করিয়া (প্রতি বৎসরে না প্রতি তিন বৎসরে এ কথাটা রয়টার কাজের হিড়িকে ঘুলাইয়া ফেলিয়াছেন) একটি পাকাপোক্ত পোলিশ বাহিনী ইংলণ্ডে মজুদ রাখা হইয়াছে। ইহারাও জনবুল মার্কা ষাঁড় লাল রঙের কট্টর দুশমন।

এই যে ইংলণ্ডের হাঁড়িতে জিয়ানো যশোরে কই শ্লেজবীক হলস্টাইনে জমানো পদ্মার নোনা ইলিশ, ইহারা লাগিবেন কোন্ কর্মে কোন্ পরবে? নূতন রাজনীতির জন্মদিনের দাওয়াতে, না ইয়োরোপের দ্বিতীয় কাপালিক শ্রাদ্ধ-বাসরের ভোজে?

২

পেটুক ছেলেকে যা কিছু করিতে বলা হউক না কেন, সে আহারাদির আলোচনায় ঠিক পৌঁছিবে। এমন কি একং দশঙের মত রসকসহীন জিনিস মুখস্থ করিতে বলিলেও সে ঠিক লুচি মণ্ডায় পৌঁছিবে। কায়দাটা দেখার মত: একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত; লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রায়ণ, পৌষ, মাগ (মাঘ) ছেলেপিলে, জ্বর, সর্দি, কাশি; গয়া, বৃন্দাবন, পুরী, রসগোল্লা, সন্দেশ, মিহি-দানা, লেডিকিনী ইত্যাদি ইত্যাদি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে নড়ায় কাহার সাধ্য।

ইংরাজ, ফরাসীর দৃঢ় বিশ্বাস যে জর্মনী পেটুক ছেলের মত। তাহাকে যে কোন কায়দার সরকার দাও না কেন, সে রাজতন্ত্রই হউক আর গণতন্ত্রই হউক, জর্মনরা ঠিক স্বৈরতন্ত্র ও কুচকাওয়াজতন্ত্রে পৌঁছিবেই। যুঙকার ও রূঢ়ের ধন-পতিরা মিলিয়া পৃথিবী জয়ের প্ল্যান আঁটিবেই। ফন পাপেন ও ট্যুসেনে বন্ধুত্ব হইবেই ও পৃথিবী জয়ের জন্য বিদেশী, টুথব্রাস-গোঁপওয়ালা, নিরক্ষর উজবুকেরও যদি প্রয়োজন হয় তাহাও সই—যদি সে উজবুক ঠিক ঠিক বক্তৃতা ঝাড়িয়া টেবিল ফাটাইতে পারে ও শান্তিপ্রিয় দেশী-বিদেশীর মাথাও এলোপাতাড়ি ফাটাইতে পারে। ইংরেজ ফরাসী বলে, "দেখো না, ১৯১৮-১৯ সালে আমরা জর্মনীকে কি রকম সরেস একখানা বাইমার রিপাবলিক দিয়াছিলাম; কিন্তু সেই একং দশং পড়িতে গিয়া তাহারা ঠিক নাৎসী গুণ্ডামিতে পৌঁছিল। ইহাদের বিশ্বাস নাই, ইহাদের "রোম রোম মে বদমায়েশী"।

পরাজিত জর্মনীকে লইয়া সমস্যাটা তাহা হইলে এই, তাহাকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা। যদি না দেওয়া যায় তবে পিটুনি পুলিস দিয়া তাহাকে আদবকায়দা শিখাইতে হইবে।

১৯৩৯ সালে আমার এক জর্মন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন: 'লড়াই শীঘ্রই লাগিবে। আমরা যদি জিতি, তবে দুনিয়ার রাজত্ব আমাদের হাতে আসিবে আর যদি হারি তাহা হইলেও। কারণ আমাদের পরাজয় অর্থই রাশিয়ার জয়। আমরা তখন লাল হইয়া যাইব। আমাদের প্রতিনিধিরা মস্কোতে যাইবে, সেখানে ভোঁতা রাশিয়ানদের তিন দিনে কাবু করিয়া তামাম ইউ এস এস আর আমাদের প্রতিনিধিরাই চালাইবে। রাশিয়ানরা বর্ণবিচার করেন না, তাহাদের বীজমন্ত্র 'সর্বোত্তম ব্যক্তি বড়কর্তা হইবে হউক না সে জর্জিয়ন'। যে রকম মুসলমানরা একদিন বলিত, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি খলিফা হইবে, হউক না সে হাবসী'। কাজেই কিছুদিনের ভিতরই দেখিতে পাইবে এক জর্মন ক্রেমলিনে বসিয়া দুনিয়া চালাইতেছে। হাঁ তামাম দুনিয়াটা, কারণ জর্মনী ইউ এস এস আরের গুষ্টিতে যদি ঢোকে, তবে বাদবাকী ইউরোপ তিন দিনেই তার খপ্পরে পড়িবে। ইংরেজ, মার্কিন কেউ ঠেকাইতে পারিবে না। তারপর পটপট করিয়া চীন, ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, মিশর। তারপর? তারপর আর কি? এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এক অখণ্ড রাজ্য হইলে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াকে একঘরে করিয়া তিন দিনের ভিতর সমাজের সামনে নাকে খত দেওয়াইব"। দেখিবে 'সব লাল হো জায়েগা', তবে রঞ্জিতি মর্মে নহে।'

শুনিয়া বলিয়াছিলাম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার কথাই যদি ফলে, তবে আমরা ভারতবাসীরাই দুনিয়ার রাজত্ব করিব। ভারতবাসীও না, আমরা বাঙালীরাই ক্রেমলিনে বসিয়া নিয়েভা নদীর ইলিশ মাছ খাইব ও দুনিয়ার রাজত্ব করিব।'

বন্ধু বলিলেন, 'সে কি কথা? তোমরা বাঙালীরা এমন কী গুণে গুণবান?'

আমি বলিলাম, 'বিলক্ষণ, আমরা লড়াই করিয়া দেশের স্বাধীনতা জিতিতে না পারি, কিন্তু মস্কোর কৌন্সিল-ঘরে আমাদের বক্তৃতা জলতরঙ্গ রুধিবে কে, হরে মুরারে।'

কিন্তু সে কথা উপস্থিত ধামাচাপা থাকুক; গোঁফে তেল দিবার সময় এখনও হয় নাই।

আমার জর্মন বন্ধুর যুক্তিতে মার্কিনিংরাজ বিশ্বাস করে। তাহাদের মাথায় ঢুকিয়াছে যে, জর্মন জিঙ্গো যে রকম পাগলা হিটলারকে কার্য উদ্ধারের জন্য দলে

নিয়াছিল, জাতধর্ম, কৌলীন্য আভিজাত্য বিসর্জন দিয়া, ঠিক সেই রকম তাহারা লাল হইয়া স্টালিনকে হিটলারের তখতে বসাইয়া দুনিয়ার বাদশাহী করিবে। অর্থাৎ নাৎসী গুণ্ডামির বদলে স্টালিনি গুণ্ডামি চালাইবে। দুই গুণ্ডামিই মার্কিনিংরাজের পক্ষে মারাত্মক, মহতী বিনষ্টি। সেই মহাপ্রলয় হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় জর্মন জিঙ্গোকে বোঝানো যে, তাহারা লাল হইয়া কেন মস্কো দরবারে কুর্নিশ দিতে যাইবে। মার্কিনিংরাজ সাহায্য করিতে প্রস্তুত, জিঙ্গোরা লাল রক্তস্রোতের উপর ভরাপালে মস্কো পৌঁছিবে রাজবেশে। উপস্থিত কোনগতিকে রুশকে ঠেকাইয়া রাখ; জর্মনী যেন মনের দুঃখে লাল গেরুয়া পরিয়া বিবাগী হইয়া মস্কো তপোবনে চলিয়া না যায়। অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীন চেম্বেরলিন নীতি "যতক্ষণ রুশে জর্মনে লড়াই চলে আমাদের পৌষ মাস, দুই দুশমনে মিলিলেই আমাদের সর্বনাশ"।

যদি বলা হয়, এক কাজ করো না কেন, নাৎসীদের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া রাজ্যশাসন দেশের জনগণের হাতে ছাড়িয়া দাও। তাহারা যে লাল হইয়া যাইবেই, এ স্বতঃসিদ্ধ পাইলে কোথায়?

মার্কিনিংরাজ বিজ্ঞের ন্যায় মৃদুহাস্য করিয়া বলে, 'ইতিহাস পড়ো। বাইমার রিপাবলিক যখন জর্মন জনগণকে ভেট দেওয়া হইল তখন তাহারা করিল কি? কোথায় না বাদশাহী মসলন্দে বসিয়া শাহেনশাহীগিরি করিবে তাহা নয়, সেই কাইজারকে তাহার জমিদারীর আমদানি কিস্তি খিলাপ না করিয়া হামেহাল পাঠাইল—এদিকে নিজে খাইতে পায় না। মুচি-মেথরকে বলা হইল, রাজা তো হইতে পারিবে না, সিংহাসন নাই, প্রেসিডেন্ট হ', তা নয় ডাকিয়া আনিল সেই যুঙ্কার পালের গোদা হিণ্ডেনবুর্গটাকে। তারপর সেই পাগলা জগাইকে। সে ব্যাটা কালাপাহাড় জাতে অস্ট্রিয়ান হইল জার্মান। মোদ্দা কথা এই, জর্মন আপামর জনসাধারণ যা, যুঙ্কারও তা, নাৎসীও তা। সব শিয়ালের এক রা। বরঞ্চ কট্টর নাৎসীরা ভালো। শক্তির উপাসক। জাতবর্ণহীন স্টালিনি নেড়া-নেড়িদের বিরুদ্ধে ইহাদের কোনো না কোনো দিন শভিনিজম-কারণ খাওয়াইয়া লড়ানো যাইবে। আপামর জনসাধারণ তো কাছাখোলা, লাল গেরুয়া পরিয়া ধেই ধেই করিয়া স্টালিনি সংকীর্তন নাচিবার গাইবার জন্য তৈয়ার হইয়া আছে। তাই শ্লেজবীক-হলস্টাইনে নাৎসী জিয়াও আর গোরাদের কড়া বারণ করিয়া দাও যেন জর্মন জনগণের সঙ্গে রাখী না বাঁধে (নন-ফ্রেটারনাইজেশন)। গোরাদেরই বা বিশ্বাস কি? দুষ্টলোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদেরও নাকি গোলাপী আমেজ লাগিয়াছে।

ঠিক এইখানটায় মার্কিনিংরাজের সঙ্গে আমার মত মিলে না। আমার বিশ্বাস, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া পাইতে চায়। স্টালিন-দত্ত গুরুমন্ত্র জপিয়া নয়। আমার মনে আছে ১৯৩২ সালে যখন জর্মনীতে নাৎসী-কম্যুনিস্টে জোর ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল তখন নাৎসীরা পথেঘাটে একে অন্যকে অভিবাদন করিত 'হাইল হিট্‌লার' বলিয়া, কম্যুনিস্টরা 'হাইল মস্কো' বলিয়া। গুণীদের বলিতে শুনিয়াছি এই মস্কোমার্কা বিদেশী ভদকা জর্মন বিয়ার ঐতিহ্য-গর্বিত জনসাধারণ আদপেই পছন্দ করিত না। কে জানে হয়ত এই কথা স্মরণ করিয়াই রুশরা আজ বার্লিনাঞ্চলে জোর করিয়া জর্মনদের 'হাইল মস্কো' বলাইতেছে না। অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিবার লোভ হইতেছে। আমাদের দেশী কম্যুনিস্টরা কিন্তু মস্কোবাগে না তাকাইয়া কোনো কর্মই করেন না, কোনো বাক্যই বলেন না। স্টালিন যদি জর্মনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তাও ভালো, যদি লড়েন তাও ভালো, যদি ফিনল্যাণ্ডের কান মলেন তাও ভালো, যদি ফিন্ কম্যুনিস্টদের তত্ত্বতাবাশ না করিয়া পাসিকিভির সঙ্গে দোস্তি করেন তাও ভালো, ইরাণ তেল দিল না বলিয়া যদি তাকে ধমক দেন তবে তাও ভাল, গ্রীক দেশসেবীদের গাছে চড়াইয়া যদি মই কাড়িয়া লন তবে তাও ভালো। কারণ বাতুশ্‌কা (ছোট বাপা) স্টালিন সর্ববিশারদ, ভগবানের (রাম রাম!) ন্যায় সর্বজ্ঞ। বিরিঞ্চিবাবার ন্যায় তিনি চন্দ্রসূর্য ওয়েল না করিলে আকাশ পাতালের বন্দোবস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা। অতএব 'হাইল মস্কো'। আমাদের এ ধর্ম পছন্দ হয় না। আতাতুর্ক পছন্দ করিতেন না বলিয়াই নব্যতুর্কের স্কন্ধ মস্কাবাগ হইতে ফিরাইয়া আঙ্কারাবাগে ইস্ক্রু টাইট করিয়া দিয়াছিলেন।

কথা হইতেছিল যে, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া লইতে চায়। তাই যদি হয় তবে বাইমার রিপাবলিকের বানচাল হইল কি করিয়া?

৩

সোশাল ডিমোক্রেটদের হাতে রাজ্য চালনার ভার সমর্পণ করাই যে প্রশস্ত ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। বাইমার রিপাবলিককে সাফল্যমণ্ডিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সোশাল ডিমোক্রেটরা। জর্মনীর খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুণীজ্ঞানী—এক কথায় যাঁহারা জর্মনীর গর্বস্বরূপ, তাঁহারা প্রায়

সকলেই ছিলেন বাইমারের পিছনে, সোশাল ডিমোক্রেটরূপে। আমরা বিশেষ করিয়া ইঁহাদের চিনিতাম, কারণ ইঁহাদের ভিতর আর্যামি গোঁড়ামি ভণ্ডামি ছিল না।

জর্মনীর দুর্দিনে সোশাল ডেমোক্রেটরা আপামর জনসাধারণকে এক পতাকার নীচে সম্মেলিত করিয়া ইন্‌ফ্লেশন, বেকারী, নাস্তিক্য, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবী জয় করার উদ্দেশ্যে নূতন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার স্বপ্ন তাঁহারা দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মানব সংসারে ভালো লোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে, প্রত্যেক জাতি আপন প্রদীপ উঁচু করিয়া তুলিলে তবে সে উৎসব সমাধা হইবে"। পৃথিবীর শান্তি ও মঙ্গল তাঁহারা কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঠিক ঐ সময়ে (১৯২০) রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। জর্মন জনসাধারণ তখন রবীন্দ্রনাথের বাণীতে নিজের মূক আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিল। কে না জানে ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমের কবি, শান্তির প্রতীক, পদদলিতের পরিত্রাণ।

তথাপি ইংরাজ ফরাসীর ভয় ছিল যে সময়কালে সোশাল ডিমোক্রেটরা বলশিদের সঙ্গে যোগদান করিবে। তাই যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য সোশাল ডিমোক্রেটরা ইংরাজ-ফরাসী ধনপতিদের সাহায্য চাহিল তাহারা সাফ জবাব দিল। ফলে বেকারি বাড়িল, ব্রনিভ হাল সামলাইতে পারিলেন না। তারপর ফন পাপেন; শ্লাইশার গর্তাঙ্কের ভিতর দিয়া নাৎসী যবনিকা পতন। ইংরাজের কথা ফলিল না, সোশাল ডিমোক্রেটরা কম্যুনিস্টদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নাৎসী অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিতে রাজী হইলেন না।

* * *

সোশাল ডিমোক্রেটরাই যে দেশের মেরুদণ্ড তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, রুশেরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে ইঁহাদেরই প্রধান শক্তি স্বীকার করিয়া নিয়াছে। ইঁহাদেরই সঙ্গে আছেন ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও লিবারেল ডিমোক্রেটিক পার্টি। কম্যুনিস্টরাও আছেন, ও বেশ জোর আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ভিতরে ভিতরে রুশ সরকার যে তাহাদেরই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিবে তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশরা জানে যে, সোশাল ডেমোক্রেটরা যদি বাঁকিয়া বসিয়া থাকে, তবে কম্যুনিস্টরা শুধু গায়ের জোরে তাহাদের প্রোগ্রাম চালু করিতে পারিবে না। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, রুশের চাল হইল সোশাল ডেমোক্রেটদের নটমঞ্চের সম্মুখে রাখিয়া দেশের প্রথম দুর্দিনের

ধাক্কা তাহাদের দিয়া সহানো। রুশদের যথেষ্ট সাহায্য না পাইয়া যখন ব্যানিভ সরকারের মত তাহাদের পার্টি-নৌকা বানচাল হইবে তখন কম্যুনিস্টরা আসরে নামিয়া "দেশোদ্ধার" করিবেন, অর্থাৎ গোটা রুশাধিকৃত অঞ্চলকে ইউ এস এস আরের অঙ্গীভূত করিবেন। সে বিপদকালে সোশাল ডিমোক্রেটরা যে কোনো কট্টর লাল-বিরোধী দর্গায় ধর্ণা দিবে তাহার উপায় নেই, কারণ রুশরা কট্টরদের নির্মমভাবে বিলোপ করিয়াছে ও করিতেছে। রুশরা জানে যে, উপস্থিত সোশাল ডিমোক্রেটদের লোকচক্ষে অপমানিত করার প্রয়োজন তাই তাহাদের সভামঞ্চে আনিবার পূর্বে বেশ করিয়া মুসোলিনী-কায়দায় জোলাপ দেওয়া হইতেছে।

অস্ট্রিয়ায় রুশরা যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাতেও ঐ চাল। বিস্তর সোশাল ডিমোক্রেটদের হরেক রঙের পোর্টফোলিও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুলিস অর্থ প্রোপাগাণ্ডা আভ্যন্তরীন মন্ত্রীর হাতে ও তিনি কম্যুনিস্ট। অর্থনৈতিক দিক দিয়াও রুশের বালাই কম। যে অঞ্চল দখল করিয়া বসিয়াছে সেখানে খানা-পিনা আছে, তাহার উপর উক্রাইন আছে। সে অঞ্চলের সমস্ত কলকারখানা সরাইয়া রাশিয়ায় লইয়া গেলেও ইহাদের অন্ততঃ অস্থিচর্মসার করিয়া রাখিতে কোনো বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

* * *

মার্কিন-ইংরাজ কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। কর্তাদের বুদ্ধির বহর কতটুকু তাহা নিম্ন খবরটুকু হইতে বিলক্ষণ বোঝা গেল।

"জর্মনীর কলকব্জা যদি কাড়িয়া লই (অর্থাৎ ডিসইনতাসট্রিয়ালাইজ) তবে তাহারা না খাইয়া মরিবে, আর যদি না কাড়ি তবে চর্বচোষ্য লালিত হইয়া পুনর্বার মস্তকোত্তলন করিয়া আমাদিগকে প্রহার করিবে।"

এই তথ্যটুকু কি বিজ্ঞের ন্যায় প্রচার করা হইল! ঘোড়াকে দানাপানি না দিলে সে মরিবে, তাহাতে আর নূতন কথা কি? আর দিলে সে গাড়ী টানিতে পারিবে (অর্থাৎ গায়ের জোরে রুশকে ঠেকাইতে পারিবে), কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে লাথিও মারিবে। গাড়ী যদি চালাইতে চাও, তবে তেজী ঘোড়া কিঞ্চিৎ দুরন্তপনা তো করিবেই। তুমি ভালো লাগাম কেনো না কেন?

দ্বিতীয় উদাহরণ পণ্য!

"কাঠের অভাব হইয়াছে বলিয়া বার্লিনের যে সব অঞ্চলে ইংরাজ-মার্কিন প্রবেশ করিয়াছে, সেখান হইতে স্টালিনি সাইনবোর্ড সরানো হইয়াছে।" খদ্দের যখন অশ্ব-বিক্রেতাকে বলিল, "বাড়ী গিয়া দেখিলাম, তোমার ঘোড়া খোঁড়া", তখন সে বলিল, "আপনার বাড়ী তো বাজারের উত্তর দিকে, ওদিকে চলিলে

আমার ঘোড়া খোঁড়া হয়ই।" খদ্দের বলিল, "তোমার যুক্তিটা তোমার ঘোড়ার মতই খোঁড়া।"

তৃতীয় উদাহরণ,

'কোনো কোনো জর্মন মেয়ে ইংরাজ সিপাহীদের নিকট হইতে চকলেট লইয়াই চম্পট দেয়।' আশ্চর্য! কিন্তু আমাদের এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, সবদেশের মেয়েরাই এ রকম করে। আর মেয়েদেরই বা দোষ দেই কেন? তোমাদের সন্তুষ্টিকরণ (এপিজমেণ্ট) অস্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া চকলেট পকেটস্থ করিয়া হিটলার তো এই সেদিন তোমাদের বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজনৈতিক স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, কিন্তু এতটা ক্ষীণ!

অধিকৃত জর্মনী চালনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর হইতে বোঝা যায়, বরঞ্চ বলা উচিত বোঝা যায় না ইংরাজ-মার্কিনের নীতি কি।

'কম্যুনিস্টরা রাজ্যশাসনে কোথাও নাই। বেভেরিয়া ও নিম্নরাইনে দক্ষিণ-পন্থী ক্যাথলিকরা সর্বময় কর্তা। হামবুর্গ ও হানোফারে পার্টিমতামতহীন বণিক ও দক্ষিণপন্থী আমলারা গুছাইয়া লইতেছেন, যদিও অন্য কেউ কেউ বখরা পাইতেছেন। হেস্সে ও মধ্য রাইনে সোশাল ডেমোক্রেটরা রাজ্য-চালনার পুরোভাগে ও উত্তরপন্থী ক্যাথলিকদের আওতায় বেস্টফালিয়েন ও ওল্ডেনবুর্গে কিছুটা রাজত্ব করিতেছেন। তদুপরি বড় বড় নগরে ইঁহারাই মেয়ার হইয়া বসিয়াছেন।

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। এ রকম পঁচিশ জায়গায় বত্রিশভাজা করিবার কি প্রয়োজন? এরকম দো-আঁসলা, তিন-আঁসলা জানোয়ার পয়দা করিবার এক্সপেরিমেণ্ট কেন? ইংলণ্ডে একবার টার্কি ও হেন্ (মুরগী) পক্ষীতে সংমিশ্রণ করাইয়া যখন টার্কিন পাখী পয়দা করা হয়, তখন ফ্রান্স বলিয়াছিল, "আমেরিকার এক আস্তাবলে গাধা ও একখানা ভাঙা বাইসিক্ল একসঙ্গে রাখার ফলে ফোর্ড গাড়ীর জন্ম হয়েছিল। সাধু সাবধান!"

তাই বলিতেছি যে, প্রকৃষ্টতম পন্থা, সোশাল ডেমোক্রেটদের শুধু রাজ্য সমর্পণ করাই নয়, তাঁহাদের সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন সাহায্যদান। রুশরা যেমন তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে সোশাল ডেমোক্রেটদের বোকা বানাইতে চাহে, তোমরা তেমনি তাঁহাদের সফলতার পথে লইয়া চল। জর্মন বড় জাত্যাভিমানী, পারতপক্ষে সে কখনও তাহার জাতীয়তাবোধ ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মুক্তির পথ তাহারই ঐতিহ্যের তাহারই বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়া। সে বলশির ধামাধরা হইতে চাহে না, তোমাদের গোলাম হইতে চাহে না। তাহাকে

যদি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে দাও তবে সে সকল শত্রুকে রোধ করিয়া শান্ত জীবনযাপন করিবেই। সোশাল ডেমোক্রেটরা শান্তি চায়।

আর শেষ কথা তো এই যে, স্বায়ত্তশাসনে সর্বজাতির অধিকার। সোশাল ডেমোক্রেটরা জর্মনজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বরণীয় তাহারই প্রতীক।

প্যালেস্টাইন

গোড়ার দিকে ইহুদি-আরবে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তর্ক উপস্থিত হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই উঠিত, সে দেশটা কাহার। ইহুদিরা বলিত, 'এই পবিত্র দেশ আমাদের পিতৃভূমি, মূসা (মোজেস) আমাদিগকে এই দেশে পথ দেখাইয়া আনেন; আমাদের গর্বস্থল রাজা সুলেমন (সলমন), দায়ুদ (ডেভিড) এই দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, আমাদের প্রপিতামহ ইব্রাহীমের (আব্রাহামের) কবর এই মাটিতে। এই দেশ আমাদের পুণ্যভূমি, এখন এ দেশকে আমাদের কর্মভূমিতে পরিণত করিতে চাহি।' (সত্যেন দত্তের 'তীর্থসলিলে' রাজা সুলেমন ও দায়ুদের গীতি দ্রষ্টব্য)।

উত্তরে আরব বলে, 'তোমাদের মত আমরাও সেমিটি, যে সব মহাপুরুষদের নাম করিলে তাঁহারা আমাদেরও পূর্বপুরুষ। তাঁহাদের গোর আমাদের তীর্থস্থল-দরগাহ। ইহাদের মহৎ কার্যকলাপ কুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু জেরুজালেম (বয়ত উল-মুকদ্দস পবিত্রালয়) আমাদিগের কাছে মক্কার পরেই সম্মানিত। কিন্তু এসব ধর্ম-সম্বন্ধীয় হার্দিক আলোচনা উপস্থিত স্থগিত রাখো। আসল কথাটা এই, তোমাদের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (খৃষ্টের বহুপূর্বে) তোমরা এ দেশ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করো; খৃষ্টের পর তোমাদের অধিকাংশ জাতভাই খৃষ্টান হইয়া যায়—তাহারা আজ আমাদের দলে, পরবর্তী যুগে তাহাদিগের অধিকাংশ আবার মুসলমান হইয়া যায়—এবং সর্বশেষে ক্রুসেডের আমলে যখন যুদ্ধ, অরাজকতা, ও অনাকৃষ্টির ফলে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, তখন তোমরা সকলেই 'পোড়া' দেশকে ছাড়িয়া কারবারে পয়সা করিবার জন্য পৃথিবীর সবত্র ছড়াইয়া পড়িলে। আমরা এই দেশের মাটিকে ভালোবাসিতাম —সেই মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আটশত বৎসর কাটাইলাম, এখন পয়সার জোর হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে ভিটা-ছাড়া করিতে চাও? তোমাদের বেশভূষা বিজাতীয়, তোমাদের আচার-ব্যবহার এদেশের প্রাচীন ইহুদি পন্থানুযায়ী নহে (অর্থাৎ যে কয়টি ইহুদি দুর্দিনে এদেশ ত্যাগ করিয়া যান নাই, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের আজ মিলে বেশী), তোমরা বার্লিন প্যারিসের

নৈতিক চরিত্র ও দুষ্ট রোগ সঙ্গে আনিয়াছ, আর সর্বশেষ কথা, আমাদের দুশমন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব করিয়াছ।'

এই তর্কাতর্কি আমি ছয় মাসকাল উদয়াস্ত শুনিয়াছি—লিখিতে গেলে একখানা ছোটখাটো বই লেখা যায়। কিন্তু এসব তর্ক আজকাল কম হয়।

১৪-১৮ যুদ্ধের সময় ইংরাজ প্যালেস্টাইনের আরবকে কথা দেয়—তখন যেখানে ইহুদির সংখ্যা নগণ্য—যে, তোমরা যদি তুর্কীর হইয়া না লড়ো তবে যুদ্ধের পর তোমাদিগকে স্বরাজ (সেলফ ডিটারমিনেশন) দিব। সঙ্গে সঙ্গে আরবদের অজানাতে, প্রধানতঃ মার্কিন ইহুদিদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে, তাহারা যদি কাইজারকে অর্থ সাহায্য করা বন্ধ করিয়া সেই অর্থ ইংরাজকে দেয় ও বিশ্ব-ইহুদি (ওয়ালর্ড জিউয়ারী) অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে, তবে যুদ্ধের পর ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে 'ন্যাশান্যাল হোম' নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে। ('ন্যাশান্যাল হোম' কথাটার বাঙলা আর করিলাম না, ইংরাজিতেই তাহার অর্থ কি, সে লইয়া বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। নিরক্ষর আরব ইংরাজীর এক বর্ণ বোঝে না, কিন্তু 'ন্যাশান্যাল হোম' যে 'ন্যাশান্যাল স্টেট' নয় সে কথা বুঝাইতে তাহার তৎপরতার অন্ত নাই। বারে বারে আরবী কথাতে শুধু চারিটি ইংরিজি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, 'ন্যাশান্যাল হোম' আর 'ন্যাশান্যাল স্টেট'। আমি যদি 'ন্যাশান্যাল হোমের' অনুবাদ 'জাতীয় ভবন' বা 'জাতীয় সদন' দিয়া করি, তদে ইহুদিরা আমাকে খুন করবে, আরবরা আমাকে খয়রাতি দিবে।)

যুদ্ধের পর যখন 'ন্যাশান্যাল হোমের' খবরটা বাহির হইল, তখন আরবরা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। অতিকষ্টে তাহাদিগকে বুঝানো হইল যে, ঐ বস্তুটি অত্যন্ত নিরীহ ঢোঁড়া সাপ। জনকয়েক ইহুদি প্যালেস্টাইনে বসবাস করিবার জন্য আসিতেছে, বিস্তর পয়সা সঙ্গে আনিবে, নিজের খাইবে পরিবে, ধর্মচর্চা করিবে, 'কলচর' করিবে, আরবের আপত্তি করিবার কি আছে। ২৬ সেপ্টেম্বরে (৫৫) প্রকাশিত বাইৎসমান্ সাহেবের এই মর্মে বুলি যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে 'জুইশ মেজরিটি' ও 'জুইশ স্টেট' চায়। সেকথা তখনকার দিনের ইংরাজ সরকার মানেন নাই—লেবার পার্টি লাস্‌কি প্রভৃতি ইহুদিদের প্রতাপে আজ মানেন।

সে যাহাই হউক, যুদ্ধাবসানে যখন এই সব আলোচনা হইতেছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, যে-সব ইংরাজ সৈন্য আরবদের সহায়তায়, লরেন্সের ধূর্তামিতে, জেরুজালেমে একটি বুলেটমাত্র খরচ না করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সেখানে থাকিবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ও অভিনব বস্তু। ১৯১৪ সালের

পূর্বে কোন রাজা গায়ের জোরে বা অন্য কোনো কায়দায় কোনো দেশ জয় করিলে সে-রাজা দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া বলিতেন না যে, তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজ্যটি সোনার থালাতে করিয়া তুলিয়া দাও, আমি গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিব। এ কায়দাটা আবিষ্কার করিলেন ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা। লীগ অব নেশনস গড়িয়া তামাম দুনিয়ার দেশপতিদের ডাকিয়া বলা হইল যে, তাহারা যেন ইংরাজকে রাজনৈতিক পূতজলে বাপ্তিস্ম করিয়া প্যালেস্টাইন, ইরাক, মিশরের 'মেনডেটরী' প্রভু বা 'অছি' নিযুক্ত করে। বিশ্বজন যেন স্বস্তিবচন ঝাড়িয়া বলে, তুমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আইনতঃ দেশটা পাইলে। পৃথিবীর নৈতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশ লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা যেন এই পর্যায়ে নূতন পরিচ্ছেদ পাড়েন।

'অছি' কথাটি শুনিলে আমাদের মত প্রাচীনপন্থীদের 'ধর্মপিতা' সমাসটি মনে পড়ে। তুর্কী ভাষায় 'অছি' অর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নাবালক শিশুর জন্য যখন অছি নিযুক্ত করা হয় তখন এই কথা অছিকে মানিয়া লইতে হয় যে, সে নিঃস্বার্থ-ভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান করিবে। আইনকানুন ভালো জানি না, তবে শুনিয়াছি যে, অছি নিয়োগের পূর্বে দেখিতে হয় যে, ঐ শিশুর স্বার্থে যেন অছির লোভ না না থাকে—থাকিলে অছিত্ব রদ-বাতিল। 'লীগে'র কর্তারা সকায়দায় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইলেন। ইংরাজ তখন বলেন নাই। কিন্তু হালে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্যালেস্টাইন আইসাক্ পাক আর রহিম নিক, সেখানে ইংরাজ স্বার্থ বরাবর অচল-অটুট থাকিবে—সেখানে বিমানঘাঁটি, পল্টন-গোয়াল থাকিবেই। লীগ-কর্তারা শুধু তম্বি করিয়া অছিদের বলিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর শাসিত দেশের কার্য-প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। সে ব্যঙ্গ-নাট্যের কথা আরেক দিন স্মরণ করাইয়া দিবেন। আসল কথা, বিশেষ লক্ষমান প্রাণীকে ষোড়শোপচারে কদলীবৃক্ষের অছি নিযুক্ত করা হইল।

সেই অছিত্বের আওতায় তারপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি বুলবুলির পাল আসিয়া আরবের গমক্ষেতে পড়িল। কিন্তু ছেলে ঘুমাইল না, পাড়া জুড়াইল না। আরবরা এক হাতে ঠেকায় ইংরাজকে, আরেক হাতে মারে ইহুদিকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন ঠেকাইতে পারিল না। 'খাজনা দেব কিসে?' শ্মশান হইতে মশান হইতে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করিয়া তখন উত্তর আসিল, 'আব্রু দিয়া, ইজ্জত দিয়া, ইমান দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া।' (কর্তার ভূত, লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু সে সমস্যা অর্থনৈতিক। বুলবুলিরা কি সঙ্গে কিছুই আনে নাই? তাহার আলোচনা আরেক দিন হইবে।

২

ইহুদিদের পক্ষে যাঁহারা যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহাদের প্রধান সাফাই এই যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে আসিবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে আনিয়াছে ও এখনো মাসে মাসে সমস্ত পৃথিবীর ইহুদি ধনপতিরা সে দেশে টাকা পয়সা ও অন্যান্য নানা তৈজসপত্র পাঠাইতেছেন।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তলাইয়া দেখিবার মত। উপনিষদের ঋষি বলেন, 'হিরণ্ময় পাত্র মধ্যে সত্য লুক্কায়িত আছেন'। অধিকাংশ লোক সেই পাত্র দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হয়, বলে না, 'হে পূষণ, পাত্রটি উন্মোচন করিয়া দেখাও ভিতরে কি আছে।'

শ্রীহট্ট বা উত্তর আসামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দেখিবেন, দুই দিকে ঘন সবুজ টিলার গায়ে গায়ে সারি সারি. কাটাছাঁটা, সযত্নে বর্ধিত চায়ের গাছ। মাঝে মাঝে সরস সতেজ গোলমোহরের গাছ, শ্যামাঙ্গী কুলী মেয়েরা কাজ করিতেছে, দূরে ছবির মত সুন্দর কলকারখানা, ঝকঝকে তকতকে সায়েবদের বাঙলো, ক্লব হৌস, গলফ লিনকস্। এমন কি দূর হইতে কুলীদের ব্যারাকগুলি পর্যন্ত সুন্দর দেখায়।

ইংরাজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়া বলে, 'দেখো, দেশের ধনদৌলত কি রকম বাড়াইয়াছি।'

ইহুদিরা যে অর্থ আনিল, তাহা দিয়া চাষের অনুপযুক্ত কোন কোন জলাভূমির জলকর্দম নিকাশ করিয়া সোনা ফলাইয়াছে। কিন্তু আসামের চা-বাগিচায় ও এই সব 'স্বর্ণভূমি'তে পার্থক্য এই যে, যদিবা আসামের চা-বাগানে কুলীরা এক বেলা খাইবার মত পয়সা রোজগার করিতে পারে, প্যালেস্টাইনের 'স্বর্ণভূমি'তে আরব চাষা-মজুরকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ট্রাক্টর পাঠাইয়াছে মার্কিন ইহুদিরা, চালাইতেছে জর্মন ইহুদিরা, ফসল কাটিতেছে পোল ইহুদিরা, বাজারে লইয়া যাইতেছে অস্ট্রিয়ান ইহুদিরা। আরব অপাংক্তেয়। কিন্তু তাহারা আপত্তি ওজর জানায় না, বলে, 'নিষ্কর্মা জমি যদি কাজে লাগাইতে পারো, তাহাতে আমার আপত্তি কি?'

কিন্তু মার খায় যখন ইহুদি সেই ফসল, সেই জাফা কমলালেবু বাজারে ছাড়ে। ইহুদি ক্ষেতখামার করিয়াছে, জাতভাই মার্কিন ধনপতিদের অফুরন্ত পয়সায়।

জায়োনিস্টদের চাপে ও কিছুটা স্বেচ্ছায় তাহারা আরো পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পুঁজি ঢালিতে প্রস্তুত। সে টাকার প্রতি প্যালেস্টাইনী ইহুদির বিশেষ দয়া-মায়া নাই—টাকাটা তো দিতেছেন গৌরী সেন। কাজেই ফসল নেবু বিক্রয় করিয়া যাহাই উঠে তাহাই তাহার লাভ। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছে, ফ্যাশেনবল ইহুদি মজুরকে বিস্তর অর্থ দিয়া যে ফসল ফলানো হইয়াছে, তাহা দিয়া লাভ করিতে হইলে বাজারের দর অপেক্ষা তাহার দর হইবে চারিগুণ, ছয়গুণ বেশী। সে দর তো ইহুদি কখনো পাইবে না, কাজেই বাজার দর অপেক্ষা আরো দুই পয়সা সস্তা করিয়া আরব চাষীকে ঘায়েল করিতে ক্ষতি কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে অর্থের অপব্যয়, কিন্তু দূরদৃষ্টি দ্বারা জায়োনিস্ট দল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, ইহাই প্রশস্ততম পন্থা। বাজারে যদি আরব চাষীকে ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ফসল কম দরে বেচিয়া কাবু করা যায়, তবে সে আর জমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে কয়াদন? পেট ভরিতে হইবে তো? বাবু যখন মনস্থির করিয়াছেন জমিটা লইবেনই, তখন উপেন ঘ্যান ঘ্যান করিয়া বাবুর পয়সা নষ্ট করেন ক্যান!

নিরুপায় হইয়া আরব জলের দরে ইহুদিকে জমি বেচিয়া আণ্ডাবাচ্চাসহ জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হয়—দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারী যেমন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিল—ভাবে সেখানে গেলে রোজগারের ধান্দা জুটিবে। সেখানেও সেই অবস্থা। মার্কিন পুঁজির জোরে ইহুদি দোকানীরা আরব ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করিতেছে আরো অল্পায়াসে, আরো কম খরচায়।

ইহুদিরা বলে, আরব চাষীরা জমি বেচে স্বেচ্ছায়, আপন খুশীতে, জমির বাজার দর কি তাহার তত্ত্ব-তাবাশ, তদ্বির-তদন্ত করিয়া। সত্যই তো আমরাও পাট বেচি স্বেচ্ছায় বাজার দর জানিয়া শুনিয়া, আমরাও ৩২-৩৩ সালে অধিকাংশ স্থলে ধান বেচিয়াছিলাম বহাল তবিয়তে খুশমর্জিতে। দুনিয়ার তাবৎ পাট আমাদের, তবু পাটের চাষী না খাইয়া মরে! ৩২-৩৩ সালে আঠারো আনা ফসল ফলাইয়াও চাষী না খাইয়া মরিল!

আরেক বিপদ, প্যালেস্টাইনে প্রজাস্বত্ব আইন নাই। আরব, তথা তুর্কী জমিদার মহাপ্রভুরা কাইরো, প্যারিসের বিলাস-বাসরের সর্দার। তালুকের পর তালুক বিক্রয় করিতেছেন পরমানন্দে, দুই পয়সা বেশী পাইয়া। যে জমিদার দেশে থাকে না, গরীব চাষার বেদনা সে বুঝিবে কি করিয়া, দরদ আসিবে কোথা হইতে? তারপর আরবদিগকে পুলিসের জোরে ভিটাজমি ছাড়া করা হয়, যে

মাটি তাহারা চাষ করিয়াছে বারো শত বৎসর ধরিয়া।

এতদ্দেশীয় সদাশয় সরকারও ব্যাপকভাবে এমন কর্মটি করেন নাই। তবু সাঁওতাল প্রজা-বিদ্রোহের করুণ কাহিনী যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে অবস্থাটা সরলই প্রতীয়মাণ হইবে।

তাই আরব লীগ, পিপলস্ পার্টি সকলেই একবাক্যে কাতর ক্রন্দন অনুনয়-বিনয় করিতেছে, আইন করা হউক ইহুদি যেন আরবের জমি কিনিতে না পারে। সর্বশেষে ভয় দেখাইয়াছে।

ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এক অদ্ভুত অভিনব অর্থনৈতিক করদোঁ সানিতের (আরব ঠেকাইয়া রাখিবার বেড়া) সৃষ্টি করিয়াছে। আরব মজুরকে ডাকে নিতান্ত কালেভদ্রে, অত্যন্ত মুশকিলে পড়িলে, জিনিসপত্র কিনে ছয়গুণ মূল্যে জাতিভাইয়ের কাছ থেকে, বেচে আরবকে, আরবের হোটেলে যায় না, আরব কোম্পানীর বাসে চড়ে না, সমস্ত টেল আভিভ শহরে (প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শহর) দশটি আরব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ বিদেশ হইতে যে লক্ষ লক্ষ পৌণ্ড ডলার মাসে মাসে অকৃপণভাবে প্যালেস্টাইনে ঢুকিতেছে, সে অর্থ ইহুদিদিগের ভিতরই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। যেটুকু বাহিরে যায়, সে আরবের জমি কিনিতে ও গলা-কাটা কারবারে আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করিতে। সেই টাকাটাও সূচ হইয়া ঢোকে, মুষল হইয়া বাহির হয়। আরবরা প্রায়ই ইহুদিদিগকে বলে, "বিদেশের পুঁজি না লইয়া আসো না একবার পাল্লা দিতে। আমরা যে রকম গরীব অবস্থায় সস্তায় কমলালেবু ফলাইতে পারি, তোমরা বাবুরা পারিবে? শুধু রুটি আর পেঁয়াজ খাইয়া কতদিন বাঁচবে?"

অথচ যে অজস্র অর্থ আসিতেছে তাহা দিয়া ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিবার উপায় নাই—কাঁচা মালের অভাবে। ভারতবর্ষে কাঁচা মাল আছে, তাহার বহু পুঁজি লণ্ডন, নিউইয়র্কে পড়িয়া আছে, তবুও দুর্বোধ্য কারণে আমরা কারখানা-কারবার করিতে পারিতেছি না। ঠিক সেই দুর্বোধ্য কারণেই ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে ব্যাপকভাবে কলকারখানা করিতে যাহারা দিতে চায় না, মধ্যপ্রাচ্যে আজ তাহাদেরই প্রতাপ।

প্যালেস্টাইনে ধন বাড়িয়াছে, কিন্তু সে-ধন আরবের শ্যাম নহে, তাহার শূল।

বারান্তরে অদ্যকার পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিব।

নেটিভ স্টেট

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে 'নেটিভ' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি, 'লেটিব' বলিলে আরো ভালো হইত। কারণ 'নেটিভ' বলিতে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু বীভৎস, যাহা কিছু পাশবিক ইঙ্গ-বঙ্গে বোঝায় ও বোঝানো উচিত তাহা বেশির ভাগ নেটিভ স্টেটে বর্তমান।

বাঙালীর উপর বিধাতার বহু অভিসম্পাত বর্ষিয়াছে; একমাত্র নেটিভ স্টেটরূপী গোদের উপর বিষফোঁড়া হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। যে দুইটি স্টেট আমরা চিনি তাহাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার প্রীতির বন্ধন আছে। কবিগুরুকে যখন বাংলাদেশও চিনিত না, তখন ত্রিপুরার মহারাজ বিশেষ দূত পাঠাইয়া কিশোর কবিকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন ও পরবর্তী যুগে তিনিও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ শান্তিনিকেতন—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রাজপুত্র রাজপরিজন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর পদপ্রান্তে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও দেশে বিদেশে কবিকে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কুচবিহারও প্রাতঃস্মরণীয় কেশবচন্দ্রের আত্মীয়তা লাভ করিয়া কৌলীন্য-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইদানীং কুচবিহারে যে গুণ্ডামি হইয়া গেল তাহা লইয়া দেশে আন্দোলন হইয়াছে ও হওয়া উচিত কিন্তু পশ্চিম ভারতে নিত্য নিত্য যে কাণ্ড হয় তাহা শুনিলে বাঙালীর চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে।

প্রথমতঃ কোনো নেটিভ স্টেটে কোনো প্রকার স্বায়ত্তশাসন নেই। কোনো কোনো অত্যন্ত "প্রগতিশীল' রাজ্যে 'ধারা' সভা থাকে। সে সভার প্রধান কর্ম রাজাকে সদুপদেশ দেওয়া। সে 'ধারাসভার' সভাপতি স্টেটের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী। রাজা সাধারণতঃ স্টেটের বাহিরে দেশের কোনো বড় শহরে বা ইয়োরোপে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন—আমাদের জমিদাররা যেরূপ কলিকাতায় নানা 'সৎ'কর্মে লিপ্ত থাকেন—প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা। তিনি সভাপতি। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই নিন্দা করিবার বুকের পাটা থাকে কয়জনের? রসিক-জনেরা তাই 'ধারাসভা'র নাম দিয়াছেন 'রাধা' সভা। রাধা যে রকম শাশুড়ী-ননদীর ভয়ে চোখের জল ফেলিতেও সাহস করিতেন না, ইঁহাদের সেই অবস্থা।

আমাদের জমিদারেরা যেরকম নায়েব-ডাকিনীর হাতে প্রজাপুত্র সমর্পণ করিয়া আরামে দূরে থাকেন, নেটিভ স্টেটেও তাই। শুধু নায়েবের অত্যাচারের সীমা আছে, কারণ হাজার হউক পুলিস আছে, ম্যাজিস্ট্রেট আছে। তাহাদিগকে

সব সময় রীতিমত 'ওয়েলিং' না করার ফলে মাঝে মাঝে কল বিগড়াইয়া যায়। নেটিফ স্টেটে সে ভয় নাই। পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ানের অতিভক্ত বাহন।

দেওয়ান যত বেশী টাকা তুলিতে পারেন, মহারাজ তত খুশী। তিনি দেশে বিদেশে যে ভূতের খর্পরে তেল ঢালিতেছেন সে ভূতের তৃষ্ণার শেষ নাই। দরিদ্র প্রজার রক্ত চুষিয়া, হাড় পিষিয়া, মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া তৈল বাহির করিতেছেন দেওয়ান। আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বক্সী হুঙ্কার দিয়া বিদ্রোহীকে কাবু করিতেছেন; কণ্ট্রাক্টে, একচেটিয়া কারবারে অন্যান্য শত উপায়ে উদরপূর্তি করিতেছেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা সিংহের অংশ পাইতেছেন। যে দেওয়ান যত বেশী শোষণ করিতে পারে সেই তত 'কর্মদক্ষ'।

প্রজার নৈতিক চরিত্র যে তাহাতে কি পরিমাণ অধঃপাতে যায় বুঝানো অসম্ভব। যেখানে প্রভু স্বৈরাচারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত সেখানে মানুষের বাঁচিবার উপায় কি থাকিতে পারে? একমাত্র পদলেহন ছাড়া তাহার অন্য কোনো পন্থা তো জানা নাই। বোম্বাই শহরে যদি দেখেন কেহ অতিরিক্ত বিনয় ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিতেছে তবে প্রশ্ন করিলে খুব সম্ভব জানিবেন যে, ভদ্রলোক নেটিভ স্টেটের লোক।

ধর্মসাক্ষী, আমরা কাহারো মনে আঘাত দিতে চাহি না কিন্তু সত্য নিরূপণে অপ্রিয় কথাও বলিতে হয়—আমরা নাচার।

আর যদি মহারাজা দেশে থাকেন তবে ব্যাপার আরও পেল্লাই। দেশী বিদেশী সায়েবসুবোতে সরকারী অতিথিশালা গমগম করিতেছে। নর্তক আসিয়াছে, নর্তকী আসিয়াছে, বাঈজী আসিয়াছে, গণিকা আসিয়াছে। হাজার মুর্গী—বাড়াইয়া বলিতেছি না—হাজার মুর্গী কাটিয়া তাহারি নির্যাস দিয়া বিশেষ জুষ তৈয়ারী হইতেছে,—বহুতর ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ডাকা হইয়াছে, তাহারা বহুতর ইনজেকসন-টনিক, অরিষ্ট-আসব-প্রাশ-মোদক, হালুয়াতরওগণ লইয়া উপস্থিত। বর্দোবার্গেন্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাঙ্গীর-বাদশাহী ডবল ডেস্টিলড আরক, আফিঙ সব কিছু প্রস্তুত। সে কী বীভৎস শিবহীন দক্ষযজ্ঞ! দেশের অন্যান্য সরকারী কাজকর্ম বন্ধ। 'উদয়াস্ত' বলিব না, 'অস্তোদয়' দেওয়ান সাহেব প্রাসাদে চর্কীবাজীর মত তুর্কীনাচ নাচিতেছেন।

কোনো কোনো মহারাজা স্বরাজ্যে ফিরিলেই অরাজকতা আরম্ভ হয়। কলির কি বিচিত্র গতি! যে সব কাণ্ড তখন হয় তাহার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপানো অসম্ভব। শুধু ডাক্তারী পুস্তকে তাহার বর্ণনা দেওয়া চলে। লজ্জাহীন উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্য তখন যে কী চরমে উঠিতে পারে তাহার বর্ণনা 'সত্যপীর'

যতই সত্যপ্রিয় হউন না কেন দিতে অক্ষম। সদাশয় সরকার বাহাদুরের কাছে এ-সব কীর্তি অজানা নহে।

এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোনো কোনো স্টেটে সর্ব-সাকুল্য আয়ের অর্ধাপেক্ষা বেশী ব্যয় হয় 'মেহমানদারী খাতায়' অর্থাৎ এই সব ভূতের যজ্ঞে।

আমার একটি রাজপুত শিষ্যের বিবাহ উৎসবে আমাকে যাইতে হইয়াছিল; যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়।

দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে অবশ্য এহসব অশ্লীলতার যোগ বিশেষ নাই। কিন্তু আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি সর্বদা মর্মাহত হইয়াছি। নেটিভ স্টেটের বালক-বালিকা ছাত্রছাত্রীদের দাস্যভাব।

এক অতি সম্ভ্রান্ত স্টেটে দেওয়ানের নাতি ইস্কুলের ছাত্র-মাস্টারের উপর ঠাকুর-দাদার অপেক্ষাও কঠিন ডাণ্ডা চালাইত। মাস্টারদের ঘরের পাশে তাহার জন্য বিশেষ বসিবার জায়গা, সেইখানে সেই শাখামৃগ তাহার ইয়ার-বক্সীদের লইয়া অঙ্গদের রায়বার বসাইত। আর কী দাপট! হেডমাস্টারকে শাসায় ঠাকুর-দাদাকে বলিয়া তাহাকে আন্দামান অর্থাৎ রাজধানী হইতে দূরে গণ্ডগ্রামে বদলি করাইবে। মাস্টার বৃদ্ধ—পেনসন-পেয়ালায় চুম্বন দিব-দিব করিতেছেন, ফস্কাইলেই সর্বনাশ। সব কিছু নীরবে সহিয়া যাইতেন।

ইস্কুল হইতে ছেলেমেয়ে বাছাই করিয়া রাজবাড়িতে রাজপুত্র রাজকন্যাগণের সঙ্গে পড়িবার জন্য লইয়া যাওয়ার রীতি কোনো কোনো স্টেটে আছে।

রাজা বিদেশে, কাজেই সে ইস্কুলের বড়া শয়তান যুবরাজের সেখানে সপত্নহীন রাজত্ব। কারণ রাজা ছাড়া যুবরাজকে তম্বী কে করিতে পারে? আর সকলেই দিন গুনিতেছেন, যুবরাজ কবে রাজা হইয়া তাহাদিগকে বড় বড় তঙ্কার নোকরি দিবেন। কাজেই যুবরাজের শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না, অন্য ছেলেমেয়েদের কি সাহস যে, যে-পাঠ যুবরাজ পড়িতে পারেন না তাহা তাহারা পড়িতে পারার দম্ভ করিবে। বাপ-মা ছেলেদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন যেন তাহারা ঐ সব লেখা-পড়ার মত অবান্তর বাহ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ না করে—সারবস্তু, যেন যুবরাজকে খুশী রাখা হয়। তিনি বড় হইয়া তাহাদের প্রতি নেকনজর দিলে তাহাদের তখন ভূগোল ইতিহাসের কি প্রয়োজন? আর লেখাপড়ায় ফপরদালালি করিয়া যদি এখন তাঁহাকে চটায় তবে পরে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে কোন্ জ্যামিতি কোন্ ব্যাকরণ? স্মরণ তো রাখিতে হইবে এযুগে চাণক্য প্রবচনের প্রথমার্ধ 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' খাটে কিন্তু 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' আর খাটে না।

যুবরাজ বড় হইলে এই সব অকাল-কুষ্মাণ্ডেরা উজীর নাজীর কোটাল হয়।

তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে শীল। কুলীনের যে নবধা কুললক্ষণ, সে সব তাবৎ কয়টির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যদি কোনো ব্যক্তিতে পান, তবে বুঝিবেন, তিনি 'নেটিভ' স্টেটের রাজার বাঁদর-নাচের পুচ্ছহীন মর্কট, অর্থাৎ সেখানকার হোমরা-চোমরা অথবা বড় কর্মচারী।

কোনো কোনো খবরের কাগজে দেখিলাম, নেটিভ স্টেটগুলিকে মধ্য-যুগের সামন্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। তাহাতে মধ্যযুগের সামন্ত রাজ্যের প্রজাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আমি পশ্চিম ভারতের যেটুকু ইতিহাস পড়িয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, মধ্যযুগে কোনো রাজা কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল-তায় মত্ত হইলে প্রজা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে তাড়াইয়াছে, অথবা অন্য সামন্ত রাজা প্রজাদের অসন্তোষের খবর পাইয়া সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন অথবা দিগ্বিজয়ী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। এখন প্রজা-বিদ্রোহেরও উপায় নাই। নানা রকম ট্রিটির জোরে মহারাজ বহিঃশক্তি আহ্বান করিয়া দুই মিনিটেই সব বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। প্রজারা কর্মে মগ্ন বলদের মত একদিকে খায় রাজার মার, অন্যদিকে খায় 'ট্রিটি'র মার।

তবু মাঝে মাঝে যখন অত্যাচার অসহ্য হয় তখন অনেক সুবিধাবাদী মকুবির জয়জয়কার আরম্ভ হয়। তাহারই একজনের সঙ্গে আমার বোম্বায়ে আলাপ হয়। তাঁহার পেশা নাকি জর্নালিজম। শুধাইলাম, 'মহাশয় কোন্ কাগজে লেখেন?' বলিলেন, 'আজ্ঞে, কোনো কাগজেই লিখি না, না লিখিয়া পয়সা কামাই।' আমি বলিলাম, 'সে কি মহাশয়, কালিদাসের 'নাই তাই খাচ্ছ' ব্যাপার নাকি?' বলিলেন, 'অনেকটা তাই; নেটিভ স্টেটে ফ্রেস কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে উপস্থিত হইয়া নানা তদ্বির-তদন্ত করিয়া রাজা বা দেওয়ানের বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করি। তারপর দেওয়ানকে বলি, 'কত ওগরাবে কও।' দেওয়ান বেশ টু পাইস দেয়—অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। তাই আর কেচ্ছাটা লেখার প্রয়োজন হয় না। আর লিখিয়াই বা হইবে কি? ফি কলম কুড়ি টাকা তো? তাহাতে আমার এক সন্ধ্যার ইয়ের খরচটাই উঠিবে না।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু যাহাদের নানা ভরসা দিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, সে প্রমাণ দেওয়ানকে যে সমঝাইয়া দিলেন, তাহাদের কি?' পাষণ্ড কি বলিল জানেন? 'আণ্ডা না ভাঙিয়া কি আর মামলেট হয়!'

কোনো কোনো নেটিভ স্টেটে প্রজামণ্ডল আছে,—শুনিলাম কুচবিহারে নাই। প্রজামণ্ডল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্টেটের প্রজাবর্গের উন্নতির চেষ্টা করেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, 'ধারা সভায়' প্রবেশ করেন ও ব্রিটিশ

ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইলে যোগদান করেন। লক্ষ্য করিয়াছি, যে স্টেটে অবিচার কম সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়া আন্দোলনে জোশ কম থাকে। ব্রিটিশ ভারতে আমরা বিদেশী রাজের বিরুদ্ধে যে জোর পাই, ভালো স্টেটে প্রজারা সে জোর পাইবে কোথা হইতে? মন্দ স্টেটে আন্দোলন ভালো চলে, কারণ রাজা বা দেওয়ান তখন বিদেশী শাসনের প্রতীক হইয়া দাঁড়ান।

পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস কর্মীরা প্রজামণ্ডলগুলির সঙ্গে সর্বদা যোগসূত্র রক্ষা করেন। পূর্ব ভারতে আমাদের অন্ততঃ খবর রাখা উচিত—না হইলে অখণ্ড সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের প্রতি রাজনৈতিক সিংহাবলোকন চক্রবালে পরিব্যাপ্ত হয় না।

কোনো কোনো স্টেটে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানও আছেন; কর্মীরা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। খুব দরকার হয় না, কারণ দেশী স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের দলাদলি কম।

এই একটিমাত্র গুণ দেশী রাজ্যে আছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সেখানে হয় না। কারণ হিন্দু-মুসলমানকে লড়াইয়া সেখানে রাজার কোনো ফায়দা নাই। কোনো কোনো স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের হৃদ্যতা দেখিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ লইয়া মনে মনে সুখস্বর্গ গড়িয়াছি।

উত্তম রাজা যে দেশী রাজ্যে কুত্রাচ নাই, এমন নহে। বরদার ভূতপূর্ব মহারাজ স্বর্গীয় সয়াজী রাওয়ের মত প্রজাপালক দেশে-বিদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তো বাল্যকাল কাটাইয়াছিলেন রাখাল ছেলেদের সঙ্গে। তিনি রাজা ছিলেন, কিন্তু কখনও যুবরাজ ছিলেন না—দত্তক পুত্ররূপে রাজা হন। দুই-একটি জনপ্রিয় রাজা যদি বা স্টেটে জন্মান তবু তাঁহাদের জন্য নেটিভ স্টেট রূপ জঞ্জাল রাখিবার প্রয়োজন নাই।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতে দেশী রাজ্যের স্থান নাই।

ধবলদন্ত

'জর্জিক জাহাজে সেদিন ভারতীয়দের প্রতি যে অদ্ভুত ব্যবহার করা হইল তাহা ধবলদন্তের, স্বাধিকার প্রমত্ততার বিকৃত রূপ। এই সম্পর্কে আমার আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে অনেক দিনের কথা; কিন্তু বহু ভারতীয় বিদেশে যান, ঘটনাটি মনে রাখিলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

১৯২৮ সালের প্রচণ্ড শীত কাবুলে প্রচণ্ডতর হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় আমানউল্লা বাচ্চা-ই-সকাওর হস্তে পরাজিত হইয়া রাতারাতি কাবুল ত্যাগ করিয়া কান্দাহার চলিয়া যান। বাচ্চা তখনও শহরে প্রবেশ করেন নাই। সেখানে তখন নির্মম বীভৎস অরাজকতা চলিয়াছে। রাজা নাই; পুলিস, মিলিটারি প্রাণরক্ষার্থে উর্দি ছাড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। শহরে রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্য লুটতরাজ, খুন-খারাবী চলিয়াছে। বাচ্চার অগ্রগামী সৈন্যরাই প্রধান দস্যু, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার রুদ্ধ করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান তখন কাবুলে ছিল না।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। ওভারকোটের লোভে যে কোনো দস্যু আপনাকে গুলি করিতে প্রস্তুত। চাহিলে পর দিলে গুলি করার রেওয়াজ আফগান দস্যুদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

খাস কাবুলীরা এরকম বিদ্রোহ ও লুটতরাজ ব্যাপারে অভ্যস্ত। বিশৃঙ্খলতার গন্ধ পাইবা মাত্রই তাহারা বছর দুইয়ের খোরাক বাড়ীতে যোগাড় করিয়া রাখে। বিপদে পড়িলেন বিদেশী অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা। ইঁহারা সকলেই কাবুলে নবাগত—কাবুলী কায়দা জানেন না। আহারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই তাঁহাদের নিরম্বু একাদশী আরম্ভ হইল—কারণ কলের জল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাচ্চা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথম 'সৎকর্ম' করিলেন—অধ্যাপক শিক্ষকদের বরখাস্ত করিয়া। প্রাপ্য বেতনও তাঁহাদিগে দেওয়া হইল না। সে-যুগে কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক ছিল না বলিয়া অধ্যাপক-শিক্ষকেরা সঞ্চিত অর্থ পেশাওয়ার বা লাহোরের ব্যাঙ্কে রাখিতেন। তাঁহারা তখন কপর্দকহীন; সে দুর্দিনে ধারই বা দিবে কে? কাবুলের সঙ্গে তখন বহির্জগতের কোনো যোগাযোগ নাই।

পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য ফরাসী, জর্মন ও ভারতীয় শিক্ষকেরা একত্র হইয়া জিরগা করিলেন। তখন প্রথম অসুবিধা হইল ভাষা লইয়া। সকলে জানেন এমন কোনো ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে সভায় মাত্র একজন বাঙালী ছিলেন। তিনি ফারসী ফরাসী জর্মন তিনটি ভাষাই জানিতেন বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি করা হইল। সভায় স্থির হইল যে, যেহেতু অধ্যাপকেরাই সর্বাধিক বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য যদি সদাশয় ব্রিটিশ লিগেশন কোনো উপায় অনুসন্ধান করিয়া দেন, তবে তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইবেন। এই মর্মে ডেপুটেশন পাঠানো স্থির হইল।

লিগেশন হইতে উত্তর আসিল ফরাসী-জর্মনরা যেন স্ব স্ব লিগেশনের দৌত্যে

নিজ নিজ অসুবিধা পেশ করেন। ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করিতে লিগেশন-কর্তা হিজ এক্সেলেন্সি লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল শ্রীযুক্ত সর ফ্রান্সিস হমফ্রিস রাজী আছেন।

ইতোমধ্যে সর ফ্রান্সিস বাচ্চার সঙ্গে আলাপ করিয়া পেশাওয়ার হইতে কাবুলে রোজ একখানা, দুইখানা হাওয়াই জাহাজ আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসী জর্মন ইতালিয়দের সেই জাহাজগুলিতে করিয়া ভারতে পাঠানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ডেপুটেশন নিবেদন করিল যে, ভারতীয় শিক্ষকেরা উপবাসে প্রায় মরিবার উপক্রম। ভারতে যাইবার অন্য সব পন্থা যখন রুদ্ধ তখন সায়েব যদি তাহাদিগকে হিন্দুস্থান পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সায়েব বলিলেন, "দেখুন কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ সরকারের সিন জেমস (অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু বিজাতীয়) কোর্টের মুখপাত্র (Representative)। ভারতীয়েরা হক্কের জোরে (as a matter of right) আমাদিগের নিকট হইতে কোনো সাহায্য দাবী করিতে পারেন না। মেহেরবানি-রূপে (as a matter of favour) চাহিতে পারেন।"

ডেপুটেশনের বাঙালী মুখপাত্রটি বলিলেন, "সে কি কথা সায়েব, এই যে হাওয়াই জাহাজ আসিতেছে সেগুলি তো ইণ্ডিয়ান আর্মির পয়সায় কেনা, পাইলট মেকানিক ভারতীয় তনখা খায়, যে জায়গায় গিয়া জাহাজখানা লইবে সেও তো ভারতের জমি।" "তুমি আবার পরের ধনে পোদ্দারী না হউক, পরের জাহাজে কাপ্তেনী কেন করিতেছ!" অবশ্য একথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

চোর বরঞ্চ ধর্মের কাহিনী শোনে—না হইলে বাল্মীকি উদ্ধার পাইতেন না—কিন্তু ধবলদন্ত হম্বড়াঙ্গির দ্বিরদরদস্তম্ভে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাঙালীটি তখন লক্ষ্য করিলেন যে, ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "সায়েব, এই যে হক্ আর মেহেরবানি লইয়া কথা বলিলাম, তাহা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত। এখন জীবনমরণ সমস্যা। ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করুন।" সদস্যগণ একবাক্যে সায় দিলেন যে, হক্ মেহেরবানি লইয়া কথা-কাটাকাটি করা বাতুলতা। আত্মানাং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি।

বাঙালীটি বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু সায়েব, আমি ভারতে, স্বদেশে মেহের-বানিরূপে যাইব না, যদি যাই, যাইব হক্কের জোরে। বন্ধুগণ, নমস্কার, সায়েব, সেলাম।"

সন্ধ্যাকালেই ভদ্রলোক খবর পাইলেন যে, তাঁহার নাম ভারত প্রত্যাগমন-কামীদের নির্ঘণ্ট হইতে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খবরটি দিলেন ভদ্র-লোকটির বন্ধু, ব্রিটিশ লিগেশনের অরিয়েন্টল সেক্রেটারী, খান বাহাদুর শেখ মহবুব আলী খান, বন্ধুভাবে, সরকারী খবর হিসাবে নয়। তারপর সেই সব জাহাজে করিয়া ফরাসী গেল, জর্মন গেল, ইতালিয় গেল, তুর্ক গেল, ইরানি গেল, ব্রিটিশ লিগেশনের মেয়েরা গেলেন। তারপর সর্বশেষে ভারতীয় মেয়েদের খোঁজ পড়িল। তাঁহাদের অনেকেই পুরুষ অভিভাবক ছাড়া হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া পেশোয়ার যাইবার হিম্মৎ পান না—কেহ কেহ গেলেন, কেহ কেহ রহিলেন। ভদ্রলোকটি রীতিমত জোর-জবরদস্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, (পরে) শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক, স্বর্গীয় মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্ত্রীকে হাওয়াই জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। তারপর অতি সর্বশেষে ভারতীয় পুরুষদের পালা আসিল। কিন্তু ভদ্রলোকটির নামে তো ঢেরা পড়িয়াছে; তিনি পেটে কিল মারিয়া কাবুলের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে ভারতবর্ষে ভদ্রলোকের পিতা পুত্রের কোনো খবর না পাইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন ও টেলিগ্রাফ আফিসে থানা বাঁধিয়াছেন। দিল্লী সিমলা যেখানে যাহাকে চিনিতেন, অহরহ তার করিতেছেন, আমার পুত্রের কি খবর! আসামের বর্তমান রাজস্বসচিব (?) মৌলবী আবদুল মতীন চৌধুরীও এক-খানা তার পাইলেন। সেইদিনই সর ডেনিস ব্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা। ভোট সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপারে সর ডেনিস মতীন সাহেবের কাছে যান। তিনি বলিলেন, "তোমরা যে কাগজে ছাপাইতেছে ভারতীয়দের আনা হইতেছে, অমুকের খবর কি?"

সর ডেনিস কাবুলে বেতার পাঠাইলেন সর ফ্রান্সিসকে, "অমুককে তার-পাঠ পাঠাও।" সাইমন কমিশন তখন আসিব-আসিব করিতেছে অথবা আসিয়াছে। সর ডেনিস সেন্ট্রাল এসেমব্লির সদস্যকে সস্তায় খুশ করিতে কেন নারাজ হইবেন। কোনো ভারতীয়কে বাঁচাইবার জন্য ঐ একটিমাত্র বেতার সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে কাবুল যায়। পেশাওয়ার সরকার ও কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশনে বেতার চলিত, বলা বাহুল্য যে, সে-বেতারের সুবিধা ভারতীয়দের দেওয়া হয় নাই। কাবুলে বসিয়া ভদ্রলোক অবশ্য এসব খবর পান নাই।

সে-বেতার লিগেশনে কি অলৌকিক কাণ্ড বা তিলিসমাত করিল তাহা স্থানা-ভাবে বাদ দিলাম। পরদিন ভদ্রলোক খবর পাইলেন, তাঁহার জন্য আগামী-কল্যের হাওয়াই জাহাজে একটি স্থান রিজার্ভ করা হইয়াছে। 'ফেবার' না

'রাইট' তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আর হইল না।

সর্বস্ব কাবুল দস্যুদের জিম্মায় ফেলিয়া মাত্র দশ সের (অথবা পৌণ্ড) লগেজ লইয়া ভদ্রলোক হাওয়াই জাহাজে করিয়া পেশাওয়ার ফিরিলেন। বিমান-ঘাঁটিতে সর ফ্রান্সিস করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমরা ভারতীয়দের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া সব কথা বলিবেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই সব কথাই বলিব।" দেশে ফিরিয়া তিনি জমিয়ত-উল-উলেমার নেতা মৌলানা হুসেন আহমদ মদনীকে আদ্যোপান্ত বলেন। আন্দোলনও হইয়াছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। লিগেশন-কর্তা প্রমোশন পাইয়া ইরাক না কোথায় চলিয়া গেলেন।

বর্ণনা শেষ করিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিন্তু আমার চরম শিক্ষা হইয়া গেল। কাবুল গিয়াছিলাম টাকা রোজগার করিয়া ইউরোপে পড়িতে যাইবার জন্য। কোন্ দেশে যাইব বহুদিন মনস্থির করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পর নির্দ্বন্দ্ব মনে ইংলণ্ড বর্জন করিলাম। পড়িতে গেলাম অন্য দেশে—ও ফরাসী জাহাজে।

চতুরঙ্গ

পূব বাংলা যখন পাকিস্তানের অংশরূপে "স্বাধীন" হল তখন ঐ অঞ্চলের লোক সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন নি, তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি কৃষ্টি গবেষণা কোন্ পথে চলবে। "অখণ্ড পাকিস্তান" নির্মাণের সহায়তা করার জন্য তাঁরা উর্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, না, যে বাংলা ঐতিহ্য উভয় বাংলা অনুকরণ করছে সেই পন্থা অবলম্বন করবেন? একটু সময় লাগলো।

(১) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার "বর্ধমান হাউসে"—"বাংলা অ্যাকাডেমি"। কিছুদিন পরেই তাঁদের প্রথম ত্রৈমাসিক বেরলো। দুই বাংলাতে তখনও পুস্তকাদি অনায়াসে গমনাগমন করতো। প্রথম সংখ্যা এ-বাংলায় পৌঁছনো মাত্রই তার আলোচনা "দেশ" পত্রিকায় বেরোয়। এ-বাংলা তাকে সানন্দ অভিনন্দন জানায়। আজ যদি দুষ্টজন বলে, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিকরা "বাংলাদেশের" লোকজনকে অখণ্ড পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় কারসাজি করছে, তবে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো,—যখন আমরা "দেশ" মারফৎ ঐ ত্রৈমাসিককে স্বাগত জানাই তখন আমাদের ভিতর কেউই রাজনৈতিক ছিলেন না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাঁদের পেটুয়া কিছু কিছু বাঙালী মোল্লা মুন্সীকে অ্যাকাডেমিতে ছলে-

বলে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলামের উত্তম উত্তম আরবী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নেই। অতএব আমাদের প্রথম কর্ম কুরান-শরীফের বাংলা অনুবাদ করা।" সভাপতি বললেন, "সে কি? আমারই জানা-মতে অন্তত পাঁচখানা বাঙলা অনুবাদ রয়েছে।" মোল্লারা: "তা হলে হদীসের (কুরানশরীফের পরেই হদীস আসে) অনুবাদ করা যাক।" আসলে মোল্লারা চান ঐ মোকায় বেশ দু পয়সা কামাতে। আর এদিকে বেচারী অ্যাকাডেমি সবে জন্ম নিয়েছে। অজাতশত্রু হতে চায়। স্বীকার করে নিল। সে কর্ম এখনও সমাপ্ত হয় নি। কারণ সমাপ্ত হলেই তো কড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। (এ টেক্‌নিক আমাদের এ দেশের ডাঙর ডাঙর আপিসাররাও জানেন।) বাঙলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান আমাকে বললেন, "এ যাবৎ তেনারা আশি হাজার টাকা গ্যাটস্থ করেছেন।" এই মোল্লাদের অনেকেই এখন খানকে সাহায্য করছেন —মীরজাফররূপে।

(২) কেন্দ্র বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।

আপনারা বাঙালদের যত মূর্খ ভাবেন তারা অতখানি মূর্খ নয়। তারা তখন অন্য প্যাঁচ কষলে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানালে, "আমাদের পাঠশালা ইস্কুলে যে-সব টেকস্‌ট বই পড়ানো হচ্ছে সেগুলো বড়ই "অনৈসলামিক ভাবাপন্ন"। অতএব সেগুলো নাকচ করে দিয়ে নয়া নয়া কেতাব লেখা হোক।" গাড়োল রাওলপিণ্ডী সে ফাঁদে পা দিল। তখন সৃষ্ট হল "কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।" কিন্তু ইয়া আল্লা ইয়া রসুল। কোথায় না তারা প্রস্তাবিত কর্মে লিপ্ত হবে, না তারা লেগে গেল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পরিপূর্ণ পদ্য-গদ্য রচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করতে। আমার মনে হয়, তখনই তারা ভিতরে ভিতরে আপন অজান্তে জেনে গেছে, ঝঞ্ঝা আসন্ন, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দফারফা করতেই হবে। অতএব বিদ্রোহী কবি কাজীই আমাদের ভরসা। কী সুন্দর তিন ভল্যুম এযাবৎ বেরিয়েছে। যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর নাম বলবো না। পাছে না টিক্কা খানের লোক তাকে গুলি করে মারে। (টিক্কা অর্থ "টুকরো"— ফারসীতে বলে "টিক্কা টিক্কা মী কুনস্‌"—"তোকে টুকরো টুকরো করবো"। আমরা যে রকম "তিনকড়ি", "এককড়ি", "ফকীর" "নফর" নাম দিই যাতে করে যম তাকে না নেয়।)

(৩) এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ ঈস্‌ট্‌ পাকিস্তান স্থাপিত হল। (ঠিক কি নাম বলতে পারছিনে।) এতেও পশ্চিম পাকের খানরা চটে গেলেন। কারণ বাঙালরা তখন বগুড়ার মহাস্থান গড়, কুমিল্লার ময়নামতী-লালমাই (এই

ময়নামতী অঞ্চলেই এখন লড়াই চলছে)—যে সব স্থলে বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত ছিল, যে সবের বর্ণনা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সং দিয়েছেন, সেই নিয়ে তারা লেকচর দিচ্ছে, সেমিনার করছে। "তোবা, তোবা" !

(৪) এবং এসবের বহু পূর্বেই আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ও সংস্কৃতির প্রধানতম অধ্যাপক, তাঁর সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক বের করে যাচ্ছেন। এবং তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর ঐ পত্রিকায় আমাদের পশ্চিম বাংলার হরেন পাল মহাশয়ের অভিধান।

এই চতুরঙ্গে বাঙলা দেশ তার আপন পথে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজনীতিকে উপেক্ষা করে। এমন সময় ইয়াহিয়া খান মারলেন ঐ প্রগতির উপর থাপ্পড়। এর উত্তরে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি।

"রাহুর দন্ত, রাহুর মতো,
একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে
সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে
মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও
রয় না কোন ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে
তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী
ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন
ক্ষণিক অপচয়ে।"

হ য ব র ল

১

তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলেন, "আসাম দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।" অথচ আদি বাসিন্দাদের নাম 'অহম'। ইহাদের নামেই দেশের নাম হওয়া উচিত 'অহম' দেশ। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, 'আসাম' হইতে 'অহম' হয় নাই,

'অহম' হইতে 'আসাম' হইয়াছে। ফোক্ ফিললজিস্ট অর্থাৎ গাঁওবুড়ো শব্দ-তাত্ত্বিক মনে মনে তর্ক করিয়াছেন যে, যেহেতু শুদ্ধ বাঙলার 'সেপার' পূর্ববঙ্গে 'হেপার', 'সাগর' 'হাওর', 'সরিষা' 'হইরা' হয়, অতএব উল্টা হিসাবও চলে—অর্থাৎ 'স' যখন 'হ' হইতে পারে তখন 'হ'-ও 'স' হইতে পারে। এই নীতি চালাইলে যে 'হাসানো' আর 'শাসানো' একই ক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়, গাঁওবুড়ারা তাহা খেয়াল করিলেন না। স্থির করিলেন 'অহম'ই 'অসম'; তারপর 'অসম' হইতে 'আসাম' হইল। তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা আসিয়া সমাধান করিলেন, "এই দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।"

গাঁওবুড়াদের মূর্খ বলিলে আমাদের অন্যায় হইবে। 'উল্টাপুরাণ' যে সর্বত্র চলে না—এ জ্ঞান এখনও বহু নাগরিকের হয় নাই। 'সায়েবরা হ্যাটকোট পরেন' অতএব 'হ্যাটকোট পরিলেই সায়েব হইয়া যাইব' 'গায়িকা সুন্দরী কাননবালা লম্বা হাতা জামা পরেন' অতএব 'লম্বা হাতা জামা পরিলে গায়িকা ও সুন্দরী হওয়া যায়' এই ভুলযুক্তিজনিত আচার তো হাটে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সর্বত্র দেখা যায়।

* * *

এই আসাম হইতে প্রত্যাগত এক বন্ধু বলিলেন যে, এতদিন আসামে যে তিন দলে রাজনৈতিক রেষারেষি চলিত তাহার সঙ্গে এখন চতুর্থ দল আসিয়া জুটিয়াছে। এই তিন দলের প্রথম দল 'আসামী' বা 'অসমিয়া' (উচ্চারণ 'অহমিয়া'); ইঁহারা আসামী ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আসামী ভাষা ও বাংলায় পার্থক্য ওড়িয়া বাঙলা অপেক্ষাও কম; আসামীদের গাত্রে আর্য ও অহম রক্তের সংমিশ্রণ, যেরকম বাঙালীর ধমনীতে আর্য ও মঙ্গোল-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয় দল শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়ার অধিবাসী বাঙালী। ইঁহারা মূলতঃ বাংলা দেশেরই লোক, ইঁহাদের বাসভূমি বাঙলাদেশ হইতে কর্তন করিয়া আসামে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনেকেই চাহেন যে, ঐ সব জিলাগুলি যেন পুনর্বার বাঙলাদেশে ফিরাইয়া লওয়া হয়। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ 'অহম'। ইঁহারা আসামের আদিম বাসিন্দা, ইঁহাদের অনেকেই আর্যরক্ত দ্বারা 'অশুদ্ধ' বা 'শুদ্ধ'—যাহাই বলুন—না হইয়া আপন আভিজাত্য রক্ষা করিয়াছেন। চতুর্থ দল নূতন আসিয়া জায়গা চাহিতেছেন, ইঁহারা গারো, লুসাই, কুকী নাগা, আবর মিশমি ইত্যাদি পার্বত্য জাতি। ইঁহারা আসামের আদিমতম বাসিন্দা এবং আসামের রাজনৈতিক যজ্ঞশালায় ইঁহারা এতদিন অপাংক্তেয় ছিলেন।

* * *

যতদূর মনে পড়িতেছে ১৮৩২ সালে কাছাড় লর্ড বেনটিঙ্কের সময় ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাহার পর একশত বৎসর কাটিয়াছে। ধীরে ধীরে ইংরাজ গারো, লুসাই, নাগা অঞ্চলে আপন ডেরা ফেলিয়া ফেলিয়া দখল বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদের জন্য ইংরাজ সরকার কি উপকার করিয়াছেন তাহার ইতিহাস লিখিবার সময় আজও হয় নাই। মোগল পাঠানরা ইঁহাদের রাজত্ব দখল করেন নাই, ইঁহাদের প্রতি কোন দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরাজ সরকারকে একদিন উভয়ার্থে 'আসামী' ঐতিহাসিক গবেষণার কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

মধ্য আফ্রিকার বনেজঙ্গলে হস্তিদন্ত-ব্যবসায়ী মুসলমান ইসলাম প্রচার করেন, বেতনভোগী ইউরোপীয় মিশনরীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। নিগ্রো মুসলমানদের কথা আজ থাক, কিন্তু খ্রীষ্টান নিগ্রোদের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা বার্নার্ড শ'র 'কৃষ্ণার ব্রহ্মান্বেষণ' পুস্তকে পাইবেন। অসভ্য সুরা-অনভ্যস্ত জনগণের ভিতর মদ্য চালাইলে কি নিদারুণ কুফল হয় ও সেই সুযোগ লইয়া বিবেকধর্মহীন পুঁজিপতিরা তাহাদের কি অনিষ্ট না করে, তাহা আঁদ্রে জিদের 'বেলজিয়স কঙ্গো' পুস্তকে পাঠক পাইবেন। ও অন্যান্য নিরপেক্ষ লেখকের অধুনা-খ্যাতিপ্রাপ্ত ফরাসী ডাকার অঞ্চলের বর্ণনায় পাইবেন।

* * *

খ্রীষ্টান মিশনরীরা লুসাই, গারো, খাসিয়া ও নাগা অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সরকারের কতটা সাহায্য পান ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করি ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যত্র মিশনরীরা সচরাচর যে সাহায্য লাভ করেন, তাহাই পাইয়াছিলেন। অধুনা মুসলমানরা খাসিয়া পাহাড়ে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন ও ব্রাহ্মরা কিয়ৎকাল ঐ স্থলে ধর্মপ্রচারের পর কয়েকটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বারান্তরে হইবে; উপস্থিত শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যে কোনো মানুষ যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, কিন্তু যে ধর্মান্তর গ্রহণে সাহায্য করে সে যেন ঠিক এইটুকু বোঝে যে, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বেশভূষা, আহার-বিহার সংক্রান্ত, দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়া, ছন্নছাড়া কোনো নূতন ক্ষতিকর পরিবেষ্টনীতে যেন টানিয়া লইয়া না যায়।

বাঙালী মুসলমান আরব বেদুইনের ন্যায় কাবাব-গোস্ত খায় না, রাইফেল লইয়া দল বাঁধিয়া হানাহানি করে না, কিন্তু এক জর্মন নৃতত্ত্ববিদ খ্রীষ্টান নাগাদের নূতন সামাজিক জীবনের সঙ্গে বসবাস করিয়া তাহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়াছেন।

কোনো কোনো পার্বত্য অঞ্চলে স্বচক্ষে কড়া মদের মাতলামি দেখিয়াছি ও বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি কোনো কোনো অঞ্চলে গোপন বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভয়, এই সব খ্রীষ্টানরা যেন আসামের চা-বাগিচার খ্রীষ্টান ম্যানেজারদের সঙ্গে জুটিয়া এক নূতন ক্রিশ্চান লীগ নির্মাণ না করে। ট্রাইবেল লীগ হউক, আমরা তাহার মঙ্গল কামনা করিব, কিন্তু ক্রিশ্চান লীগ করিলে পার্বত্য জাতিরা আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আর বাক্যবিন্যাস করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে শেষবারের মত একখানি চিঠি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। হাজরা লেন হইতে শ্রীমতী ঘোষ লিখিতেছেন ;—

'আমার ধারণা, অল্প একটু চেষ্টা করলেই বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধতায় যে কোন ভারতীয় পণ্ডিতের সমকক্ষ হতে পারবে। প্রমাণস্বরূপ একটা উদাহরণ দিতে পারি,—যদিও সেটি এত তুচ্ছ যে বলতে সংকুচিত হচ্ছি। পাঞ্জাবী অধ্যাপকটির ক্লাসে আমরা যে কয়টি ছাত্রী ছিলাম, তাহাদের মধ্যে তিনি বাঙালীর উচ্চারণে কখনো কোনো ভুল তো ধরেনই নি ; এমন কি সময়ে সময়ে একটু বেশী প্রশংসা করতেন।' (লেখিকা দিল্লী কলেজ পড়িতেন।)

সর্বশেষ লেখিকার বক্তব্য—

"যদি কলকাতার স্কুলগুলির সংস্কৃত শিক্ষকেরা এ বিষয়ে একটু অবহিত হন, তাহলে বোধ হয় কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে।"

সবিস্তার মন্তব্য অনাবশ্যক। শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা যদি সত্যই কঠিন না হয়, তাহা হ'লে এই স্থলেই উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে।

* * *

আমরা যখন সংস্কৃত শিখি, আরবী ফারসী শিখি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য এই নহে যে, সংস্কৃত অথবা আরবীতে সাহিত্য সৃষ্টি করিব। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িয়া হৃদয়মনকে সংস্কৃত ও ধনবন্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ঐ সব সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, উহাদের পরশমণি দ্বারা যাচাই করিয়া করিয়া মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা। উদাহরণরূপে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত না জানিলে 'যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতাটি লিখিতে পারিতেন না, প্রথম চৌধুরী উত্তম ফরাসী ও বিশেষতঃ

আনাতোল ফ্রাঁস না পড়িলে কখনো বাংলাতে নূতন শৈলী প্রবর্তন করিতে পারিতেন না।

ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন সাহিত্য আজ এত সমৃদ্ধ যে গ্রীক লাতিনের জ্ঞান না থাকিলেও ইহাদের যে কোনো ভাষাভাষী মাতৃভাষার সাতজন ভালো লেখকের শৈলী মিশ্রণ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারে; বিষয়বস্তু অনুসারে গড়িয়া পিটিয়া নূতন ঢং তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু বাঙলাভাষা এখনো অত্যন্ত অপক্ক, সাহিত্য বড়ই দরিদ্র।

সংস্কৃতই যে জানিতে হইবে এমন কোনো কথা নহে। ইংরিজি ফরাসী বা আরবী যে কোনো সাহিত্যের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেই ভাষা ও সাহিত্যের মাপকাঠি পাওয়া যায়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য না পড়িলে মনে হয় অধিকাংশ লেখকেরা যেন শুধু বাঙলার পুঁজিই ভাঙাইয়া খাইতেছেন। কিন্তু এককালে তো এ রকম ছিল না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই যে শুধু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সকলেই ইংরিজি বেশ ভাল করিয়া জানিতেন।

ভারতচন্দ্র ফারসী ও সংস্কৃত দুই ভাষাই জানিতেন, এবং কী প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ যে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল ও মোগল বিলাসের যে কী সন্ধান তিনি রাখিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৭-৮ পৃষ্ঠা পশ্য।

(এস্থলে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ বাঙালী পাঠক এই দুই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাবৎ আরবী ফারসী শব্দ বুঝেন? না ইহাদের অর্থ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে—আমার কাছে দ্বিতীয় খণ্ড নাই।)

যে কবি অত্যন্ত সহজ সরল অনুভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহার জন্য হয়ত সংস্কৃতের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই; জসীমউদ্দীন চসার সেক্সপীয়র পড়িয়াছেন কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর।

যাঁহারা জটিল নভেল লেখেন ও উপন্যাস রচনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই উপরের মন্তব্যগুলি করিলাম।

৩

আমরা সাধারণতঃ যখন ইয়োরোপে বা ইয়োরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি, তখন প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে ইয়োরোপ সম্বন্ধে আমাদের প্রায়

সকল জ্ঞান ইংরিজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত এবং ইংরিজিতে যে সব ফরাসী জর্মন ইত্যাদি গ্রন্থ অনূদিত হয়, সেগুলি প্রায়শঃ ইংরেজ মনকে দোলা দিয়াছে বলিয়াই ঐ ভাষাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ বহুস্থলে সেগুলি খাস ফরাসী জর্মন নহে, ইংরাজকে খুশী করিতে পারিয়াছে, ঈষৎ ইংরাজ-ভাবাপন্ন বলিয়া।

অথচ ইংরেজ ও ফরাসী সে কী ভীষণ দুই পৃথক জাত সে সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে নির্ভয়ে বলা যায় ফরাসী সাহিত্য ইংরাজি হইতে বিশেষ কিছু গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ইংরাজি পদে পদে ফরাসীর হাত ধরিয়া চলিয়াছে। তামাম ফরাসী ভাষাতে একশতটি ইংরাজি শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; ইংরাজিতে শুধু ফরাসী শব্দ নহে, গোটা বাক্য বিস্তরে বিস্তরে আছে। ইংরাজের পোশাকী রান্না বলিয়া কোনো বস্তু নাই —ভদ্র খাবারের "মেনু" মাত্রই আগাগোড়া ফরাসীতে লেখা। এমন কি ভিয়েনার "ভিনার স্নিৎসেল" পর্যন্ত ইংরাজি "মেনু"তে ফরাসীর মধ্যস্থতায় "এস্‌কেলপ দ্য ভ্য আ লা ভিয়েনেয়াজ" রূপে পৌঁছিয়াছে।

ইংরিজি সঙ্গীত বলিয়া কোনো বস্তু নাই—যাহা কিছু তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ জর্মন-ফরাসী-ইতালীয়-রুশ। তামাম বৎসর চালু থাকে এ রকম অপেরা গৃহ একটিও লণ্ডনে নাই; উত্তম অপেরা শুনিতে হইলে ড্রেসডেন যাও, ম্যুনিক যাও, বন্ যাও, ভিয়েনা যাও, প্যারিস যাও।

ইংরেজ মেয়ে ফ্রক ব্লাউজ কিনিতে প্যারিস যায়, ছবি আঁকা শিখিতে প্যারিস যায়, ভাষা শিখিতে প্যারিস যায়, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্য আস্বাদ করিতে প্যারিস যায়, বোতল বোতল বর্দো-বার্গণ্ডী শ্যেম্পেন খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যায়—ফরাসী স্কচ-হুইস্কি খাইতেছে আর মারোয়াড়ী পাঁঠার কালিয়া খাইতেছে—একই কথা।

ফরাসী ইংরাজকে বলে "চরুয়া" অর্থাৎ চরের বাসিন্দা অর্থাৎ খানদানহীন ঔপনিবেশিক। পদ্মার পারের জমিদার পদ্মার চর-বাসিন্দাকে যে রকম অবহেলা করে, ভাবে—চর আজ আছে কাল নাই—খানদানের বনিয়াদ গড়িবে কি প্রকারে, ফরাসী ইংরাজ সম্বন্ধে সেই রকম ভাবে। চ্যানেল পার হইয়া তাহাকে লণ্ডন যাইতে হইলে, তাহার মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত হয়।

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলি করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যেন ইয়োরোপের তাবৎ কর্মকীর্তি ইংরেজের জমার খাতায় লিখিয়া তাহাকে অহেতুক ভক্তি না দেখাই। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী ও জর্মন পড়াইবার ব্যাপক ব্যবস্থা যেন এদেশের স্কুল-কলেজে করা হয়। আমাদের মনে হয় কলিকাতার ছেলেরা এককালে যেটুকু ফরাসী-

জর্মন শিখিত এখন যেন সেইটুকুও শিখিতেছে না।

আমাদের ইস্কুল-কলেজে কি বিকট আনাড়ি কায়দায় ভাষা শিখানো হয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আরেকদিন করিবার বাসনা রহিল। উপস্থিত শুধু বলি চারি বৎসর ইস্কুলে ও চারি বৎসর কলেজে সংস্কৃত অথবা ফারসী পড়ার পরও ছাত্র ঐ সব ভাষাতে সড়গড় হয় না এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোনো সভ্য দেশে দেখি নাই—শুনি নাই।

৪

এক প্রসিদ্ধ আরব লেখকের 'স্বগতঃ' পড়িতেছিলাম।

"ধনীরা বলে, 'অর্থোপার্জন করা কঠিন, জ্ঞানার্জনের অপেক্ষাও কঠিন।' পণ্ডিতেরা বলেন, 'জ্ঞানার্জন অর্থোপার্জনের অপেক্ষা কঠিন; অতএব জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান ও মহৎ।' আমি বিস্তর বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, "আমরা—অর্থাৎ জ্ঞানীরা—যদি কখনও অর্থ পাই, তবে সে অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম এবং অনেক সময় ধনীদের চেয়েও সৎপথে অর্থ ব্যয় করি, কিন্তু ধনীরা যখন আমাদের সম্পদ অর্থাৎ পুস্তকরাজি পায়, তখন সেগুলির ব্যবহার বিলকুল করিতে পারে না। অতএব সপ্রমাণ হইল জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আরব লেখকের কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গত শনি, রবি, সোমবারে বোম্বাই বাজারে যে তুমুল কাণ্ড দেখিলাম, তাহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ আর রহিল না।

একশত হইতে উপরের নোট আর যত্রতত্র ভাঙানো যাইবে না খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র কালাবাজারীদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ফালতু ট্যাক্স হইতে আত্মত্রাণ করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বিস্তরে বিস্তরে একশত, এক হাজার টাকার নোট গৃহে লোহার সিন্দুকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছিল, সে টাকা লইয়া তাহারা করিবে কি?

তখন কালাবাজারীরা ছুটিল ব্যাঙ্কারদের কাছে। 'দয়া করিয়া, ঘুষ লইয়া নোটগুলি লও, হিসাবে দেখাও যে বহুদিন ধরিয়া এই নোটগুলি তোমাদের ব্যাঙ্কে জমা ছিল। আমরা বাঁচি।' ব্যাঙ্কারদের জেলের ভয় আছে; কাজেই পন্থা বন্ধ।

কেহ ছুটিল সোনার বাজারে। সে বাজারে এমনি হিড়িক লাগিল যে, দাম হুশ হুশ করিয়া গগনস্পর্শী হইতে লাগিল। কর্তারা সোনার বাজার বন্ধ

করিয়া দিলেন।

কেহ ছুটিল তাড়া তাড়া নোট পকেটে করিয়া শরাবের দোকানে। এক টাকার মদ খাইয়া একশত টাকার নোট ভাঙাইবার চেষ্টা করে। আমি গিয়াছিলাম এক বোতল সোডা খাইতে, দোকানী সোডা দিবার পূর্বে সন্তর্পণে কানে কানে প্রশ্নবাণে প্রাণ হানে, 'একশত টাকার নোট নয় তো স্যার? ভাঙানি নাই।'

বিস্ময় মানিলাম। প্রায় ছয় মাস হইল আমার মত কারবারী-বুদ্ধি-বিবর্জিত মূর্খও বিলাতি মাসিকে পড়িয়াছিল যে, ইংলণ্ডে কালাবাজারের ফাঁপানো পয়সাকে কাবুতে আনিবার জন্য দশ পৌণ্ড নোটের উপর কড়া আইন চালানো হইয়াছে। সেই মাসিক কি এদেশের কারবারীরা পড়ে নাই? পড়িয়া থাকিলে ছোট নোটে ভাঙাইয়া রাখিলেই পারিত।

আরব ঠিকই বলিয়াছিলেন, ধনীরা পুস্তক (এমন কি মাসিক কাগজও) পড়িতে জানে না।

৫

বাঙলা ভাষায় একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কথা স্মরণ করিতেছি। কি অসাধারণ পরিশ্রম, কি অপূর্ব বিশ্লেষণ, অবিমিশ্র যুক্তিতর্কের কি অদ্ভুত ক্রমবিকাশ এই পুস্তকে আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভাষা ও শৈলী সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুক্তিতর্কপূর্ণ রচনায় এই ভাষাকেই আজ পর্যন্ত কেহই পরাজিত করিতে পারেন নাই। অনেকের মতে বাংলা গদ্য রচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রে'র পর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয় নাই।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। বঙ্কিম কয়েকজন জর্মন পণ্ডিতের নাম এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই যুগে প্রত্যেকের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ জর্মনে কি সে খবর লইয়া বাঙলায় বানান করিয়াছেন। আমরা নির্বিকার চিত্তে নিত্য নিত্য 'জওহরলাল', 'প্যাটেল', 'মালব্য' লিখি, 'পটোডি'র নওয়াব ও 'ভিমু মনকদে'র কথা আর তুলিলাম না।

সে কথা থাকুক। কিন্তু বঙ্কিমের পুস্তকখানা বাঙলায় লেখা, বাঙলা লিপিতে। যদি পুস্তকখানা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইত, তবে বহু অবাঙালী অনায়াসে ইহা পড়িয়া উপকৃত হইতে পারিতেন।

পাঠক পত্রপাঠ শুধাইবেন বাঙলা, হিন্দী, গুজরাতি; মরাঠিতে কি এতই

সাদৃশ্য যে শুধু ভিন্ন লিপি বলিয়া, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের রচনা পড়িতে পারে না ?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত রচনাটি পাঠ করুন।

'ব্যায়ামচর্চা ভারতত অতি পুরনি কালরে পরা প্রচলিত ; অসমতো নতুন নহয়। অহোম রজা সকলর দিনত অসমত ব্যায়ামর খুব আদর আছিল। বিশেষকৈ মহারাজ রুদ্রসিংহর দিনত ইয়ার প্রসার বেচী হয়। তেঁও অসমর জাতীয় উৎসব আদিত ব্যায়ামর দৃশ্য দেখুবার নিয়ম করিছিল।'

একখানা আসামি পুস্তিকা হইতে এই কয়টি পংক্তি তুলিয়া দিলাম ; ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়া সহৃদয় সরল পাঠককে অপমানিত করিতে চাহি না। যে লিপিতে লেখা হইয়াছে অক্ষরে অক্ষরে সেই রকম তুলিয়া দিলাম ; কেবলমাত্র বক্তব্য যে 'র' অক্ষর আসামিতে 'ব' অক্ষরের পেট কাটিয়া করা হয় এবং 'ওয়া' উচ্চারণ প্রকাশ করিতে হইলে 'ব' অক্ষরের উপরে একটি হসন্ত জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

এই কয়টি পংক্তিই যদি কোনো বিজাতীয় লিপিতে লেখা হইত, তবে এ ভাষা যে না শিখিয়াও পড়া যায়, সে তত্ত্বটুকু শিখিতে আমাদের মত অনভিজ্ঞের এক যুগ কাটিয়া যাইত।

পুনরায় দেখুন :

'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে' বাক্যটি হিন্দীতে 'ভারতবর্ষকী অর্থ-নৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করতী হৈ', এবং গুজরাতিতে 'ভারতবর্ষনী অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করে ছে' বলিলে বিশেষ ভুল হয় না কিন্তু যেহেতু গুজরাতি ও হিন্দী ভিন্ন লিপিতে লেখা হয়, আমরা এই সব ভাষা দূরে রাখি ; ঐ সব ভাষা-ভাষীরাও একে অন্যের মধ্যে তাহাই করেন।

এই বাক্যটিই ফরাসীতে বলি :

Ie progres economique de I' Indedepend sur son Independance politique.

লিপি একই, অর্থাৎ ইংরাজি ; কাজেই ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে অতি অথর্ব ইংরাজও তাড়াতাড়িতে ফরাসী শিখিতে পারে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন, তাবৎ ভারতবর্ষে একই লিপি প্রচলিত হইলে ভালো হয় কি না ?

তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন—শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীযুত—সেন মহোদয়

জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাবৎ পৃথিবীর জন্য একই লিপি হইলে ভালো হয় কি না? অর্থাৎ লাতিন লিপি—যে লিপিতে লাতিন, ইংরাজি, ফরাসী, ইতালিয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, তুর্কী ও অধিকাংশ জর্মন পুস্তক লেখা হয়।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। প্রথম যৌবনে এক গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গুরু অন্ততঃপক্ষে একশতটি ভাষা জানিতেন ও খুব সম্ভব একশত হইতে দুই শতের মধ্যেই ঠিক হিসাব পড়ে। এবং প্রত্যেকটি ভাষাই সাধারণ গ্র্যাডুয়েট যতটা সংস্কৃত বা ফারসী জানেন তাহা অপেক্ষা বেশী জানিতেন। সাধারণ গ্র্যাডুয়েট আট বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। সেই হিসাবে গুরুর বয়স অন্ততঃপক্ষে ১৫০ × ৮ = ১২০০ বৎসর হওয়া উচিত ছিল; যদি তিন-তিনটি ভাষা একসঙ্গে শিখিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স ৪০০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গুরু 'বিরিঞ্চি বাবা' নহেন ও ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন এবং শেষের দশ বৎসর খুব সম্ভব কোনো নূতন ভাষা শিখেন নাই।

তবেই প্রশ্ন এই অলৌকিক কাণ্ড কি প্রকারে সম্ভবপর হইল?

স্বীকার করি গুরু ভাষার জহুরী ছিলেন ও ভাষা শিখিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ভালো গুরু পাইলে, অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি উত্তম হইলে অল্পায়াসে এক ডজন ভাষা দশ বৎসরে শিখা যায়। শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন, তাহা নিষ্ঠা। এবং তৃতীয়তঃ কণ্ঠস্থ করা অপ্রয়োজনীয়—এই অদ্ভুত বিজাতীয় অনৈসর্গিক পাণ্ডববর্জিত ধারণা মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করা।

* * *

আরেকটি প্রশ্ন। 'প্যারিস' লিখিব, না 'পারি'? 'ফরাসিস' লিখিব, না 'ফরাসী', না 'ফ্রেঞ্চ'; 'বেলিন' না 'বার্লিন'; 'এ্যাক্সলা শাপেল' না 'আখেন' (প্রথমটি ফরাসী উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ভাষায় ইহাই চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি জর্মন ও শহরটি জর্মনীতে অবস্থিত)? 'মস্কভা', না 'মস্কৌ', না 'মস্কো'; 'শ্যাম' না 'সিরিয়া', 'যীশু', না 'য়েশু', না 'জীসস'? ১৮৭০-৮০ খৃষ্টাব্দে এই সব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কলিকাতায় একটি কমিটি নির্মিত হয়, তাহার রিপোর্ট এ যাবৎ দেখি নাই। কোনো পাঠক দেখিয়াছেন কি?

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, প্রিয়ভাষীজনকে ধনহীন মনে করা দুর্জনের লক্ষণ। কিন্তু প্রিয়ভাষণেরও তো একটি সীমা থাকার প্রয়োজন। আমরা স্থির করিয়াছি বিলাতি কমিশন না আসা পর্যন্ত টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিয়া রাজনৈতিক আবহাওয়া অহেতুক উষ্ণ করিব না, বিলাতি কর্তাদের গরমে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই সুযোগে এ্যাটলি সাহেবের প্রিয়ভাষণ যে অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার পরিধান করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে—বধূটি খুব সম্ভব কুরূপা। তবু গুরুজনেরা বলিতেছেন, বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলয়। হইতে পারে; কিন্তু কন্যাকর্তাকে বিশ্বাস করিয়া সুরূপা বধূলাভের আশা নগণ্য বলিয়াই 'কনে দেখার' প্রথা এদেশে প্রচলিত।

সে যাহাই হউক, সর্বশেষ উপমা শুনিলাম নিউ ইয়র্কের কোনো এক খবরের কাগজের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার নিকট হইতে। তিনি মনে মনে এক নদীর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার একপারে এ্যাটলি সাহেব, হাতে নাকি বহুমূল্য স্বরাজ; অন্য পারে তাবৎ ভারতীয়। সংবাদদাতা বলিতেছেন, শুধু কংগ্রেস, শুধু লীগ, শুধু রাজসংঘ, শুধু হরিজন সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেই হইবে না; সকলকে এক যোগে একসঙ্গে সে বৈতরণী পার হইতে হইবে।

বাল্যবয়সে বিস্তর ভারতীয় বিস্তর নদী সাঁতরাইয়া পার হয়, এবারেও চেষ্টা করিবে; কিন্তু প্রশ্ন—কে কে জলে নামিবেন? কংগ্রেস তো নামিবেনই, সায়েবের হাতে যখন স্বরাজ রহিয়াছে, লীগ নামিবেন কি? কারণ সংবাদদাতা বলিয়াছেন, সায়েবের হাতে স্বরাজ, পাকিস্তান আছে কি না বলেন নাই। না হয় লীগও নামিলেন; কিন্তু রাজারা তো কখনো সাঁতার কাটেন না। প্রজাদের পৃষ্ঠে বসিয়া যে যাইবেন তাহারও কোনো উপায় নাই; কারণ প্রথমতঃ প্রজাদের সে-সন্তরণে যোগ দিবার কোনো প্রস্তাবই হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহারা সরজমিনে উপস্থিত থাকিলে মণিটির হিস্যা পাইবার জন্য চেল্লাচেল্লি করিবে, হয়ত বা সাকুল্য মণিলাভের তালে থাকিবে। কাজেই মনে হইতেছে রাজারা দুইশত বৎসরের প্রাচীন খানদানি বাতরোগের অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে কৃত সনাতন সন্ধিশর্তের দোহাই দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিবেন অথবা শূন্যে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতারের ভান করিবেন। হরিজন নামিতে পারেন, কারণ কূপ অপবিত্র হইতে পারে, মা-গঙ্গার সে ভয় নাই।

কিন্তু একযোগে সাঁতার কাটিতে হইবে। বয়নাক্কাটা বিবেচনা করুন। রুশ

বাদ দিলে তামাম ইয়োরোপ ভারতের চেয়ে ক্ষুদ্র, তবু তথাকার কর্তারা সাঁতার কাটিবার সময় একে অন্যের গলা এমনি টিপিয়া ধরেন, যাহাকে বলে মহাযুদ্ধ। আর শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর আপামর জনসাধারণকে সেই নদীতে নামানো চাই, কি অস্ট্রেলিয়া, কি আমেরিকা, কি ভারত—কাহারও রেহাই নাই। এই এক জন্মেই দুইটি দক্ষযজ্ঞ দেখিলাম। তাহারই এক ছাগ-মুণ্ড তম্বি করিয়া বলিতেছেন, একযোগে সাঁতরাও।

না হয় সাঁতরাইলাম, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ক্রীপস-নদীতে যে হাঙর-কুমীর আমাদের পা কামড়াইয়া সব কিছু ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা ইতোমধ্যে বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন কি?

সর্বশেষ প্রশ্ন, সায়েবের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। এ যেন 'ফোকা' 'ধোকা' খেলা। আমরা সকলে এক যোগে হাঙর-কুমীর এড়াইয়া নদী পার হইয়া এক বাক্যে চীৎকার করিয়া বলিব, 'আমরা ফোকা চাই' অথবা 'ধোকা চাই', তখন সায়েব হস্তোন্মোচন করিবেন।

তখন আমাকে দোষ দিবেন না।